উন্মেষ

উন্মেষ

প্রচ্ছদ : রাহুল চক্রবর্তী। উদয়পুর।

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা

উদয়পুর শাখা ও সাউথ জোনাল কমিটি

শারদ সম্মান ২০২৪ খ্রীঃ।

উপদেষ্টা পরিষদ

ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক
ডাঃ এন.এল. ভৌমিক
ডাঃ অভিজিৎ দত্ত
ডাঃ এন.সি. দাস
দিবাকর দেবনাথ
প্রাণময় সাহা
ঝুমা দেব
ডাঃ সৌমিক চক্রবর্তী
ডাঃ অমরেশ ভৌমিক

কার্যকরী কমিটি

ডাঃ সঞ্জয় আইন (সভাপতি)
দীপঙ্কর শূর (সহ সভাপতি)
রীটন দেববর্মা (সহ সভাপতি)
পার্থ প্রতিম সাহা (আহ্বায়ক)
টিঙ্কু দেবনাথ (যুগ্ম আহ্বায়ক)
মানস কুমার রায় (যুগ্ম আহ্বায়ক)
স্বপন কুমার সাহা (কোষাধ্যক্ষ)
শ্যামলেন্দু বর্ধন
নারায়ণ দাস
সীতা দাস
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
রাকেশ দেবনাথ
লিটন দেবনাথ

অনুষ্ঠান পরিচালন উপকমিটি

দীপঙ্কর শূর (যুগ্ম আহ্বায়ক)
টিঙ্কু দেবনাথ (যুগ্ম আহ্বায়ক)
মানস কুমার রায়
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
প্রিয়াংকা দত্ত
সংযুক্তা সাহা
রাহুল চক্রবর্তী
উমা দাস

অভ্যর্থনা উপকমিটি

নারায়ণ দাস (যুগ্ম আহ্বায়ক)
স্বপন কুমার সাহা (যুগ্ম আহ্বায়ক)
শ্যামলেন্দু বর্ধন
সীতা দাস
রীটন দেববর্মা
রাকেশ দেবনাথ
লিটন দেবনাথ

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

পারমিতা দাস (যুগ্ম আহ্বায়ক)
সুকান্ত ঘোষ (যুগ্ম আহ্বায়ক)
রুমা চক্রবর্তী
দেবাদৃতা রায়
সংকর্ষণ ঘোষ

'উন্মেষ' ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৪ খ্রীঃ।

'উন্মেষ' প্রকাশদল

শুভাশিস চৌধুরী
নন্দিতা দত্ত
অমিতাভ দাশ (আহ্বায়ক)
মানস কুমার রায় (যুগ্ম আহ্বায়ক)
দীপঙ্কর শূর
রাহুল চক্রবর্তী

নামলিপি - মতিলাল গোস্বামী
অলংকরণ - জাকির, অমিতাভ, দীপঙ্কর
অক্ষর বিন্যাস - জাকির হোসেন
মুদ্রণ - জে.কে.গ্রাফিক্স, উদয়পুর।
(৯৮৫৬৬৮৭৬২২//৮২৫৭০১৯৯৫৬)
প্রকাশক - সম্পাদক।
হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা।
উদয়পুর শাখা ও সাউথ জোনাল কমিটি।

দ্বিশত জন্মবর্ষে মধু কবিকে উন্মেষ অঞ্জলি

(১৮২৪-১৮৭৩)

মাইকেল দরিদ্র বাংলার এক অসাধারণ সম্পদ। তাঁহার সকল দোষ সত্ত্বেও তিনি মহাকবি এবং বাংলা ভাষা তাঁহার দানে সৌভাগ্যশালিনী। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এরূপ প্রতিভাসম্পন্ন কবি বাংলায় আর কেহ প্রাদুর্ভূত হন নাই।

উদ্বোধন আষাঢ় ১৩১৮, ১১বর্ষ।

সময়ের ঘড়ি ধরে চলছে জীবন-যাপন। শরৎ আসে, শিউলি গন্ধ ছড়ায়। আবহমান কালের উৎসব ভাবনা আনন্দ দোলা দেয় বিষন্ন মনে! স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে তাঁর আগমনীতে সত্যিকার অর্থেই হবে অসুরদলন? দ্বিশত জন্মবর্ষে মধু কবিও যেন আমাদের মননে সেই বার্তাই ছড়িয়ে যান।

বিনীত
উন্মেষ প্রকাশদল

OBITUARY

In our journey of dedicade we lost some of our dear members :

[redacted]

Dr. Ratan Bhattacharjee, Agartala
Er. Harinarayan Roy, Agartala
Tapan Roy, Kamalpur
Partha Sengupta, Kumarghat
Subimal Dey, Kamalpur
Jayanta Paul, Agartala
Basanta Datta, Bamutia
Hareranjan Bhowmik, Santir Bazar
Purnima Sen, Sabroom
Nepal Nag, Belonia
Prabodh Chandra Roy, Udaipur
Dr. Amitava Majumder, Agartala
Ramen Deb, Jirania
Amal Bikash Saha, Agartala
Dr. Arun Kr. Debbarma
Joy Kumar Sinha
Lipika Datta, Khowai
Manika Roy, Udaipur
Goutam Debbarma, Agartala
Dr. Bibhas Rn. Paul Choudhury, Dharmanagar
Minati Bhattacharjee, Kailashaha
Dr. Animesh Ghosh, Agartala
Badhan Chakraborty, Belonia
Bhanukanta Roy, Bishalgarh
Swapan Das, Bishalgarh
Dr. Beenapani Doley, Agartala
Shibu Das, Udaipur
Samiran Baidya, Belonia
Dr. Ila Lodh, Agartala
Dr. Kingshuk Datta, Agartala
Dr. Naresh Tripura, Manu
Ratan Sen, Sabroom
Shibani Chakraborty, Agartala
Shipra Das, Agartala
Arabinda Basu, Jirania

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

প্রবন্ধ

১।	বেলুড় মঠে শারদীয়া দুর্গা আরাধনা ও স্বামী বিবেকানন্দ	স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ	১-২
২।	বৌদ্ধ উৎসব	শ্রীমৎ কুশলায়ন ভিক্ষু	৩-৪
৩।	ব্যতিক্রমী চলচিত্র নির্মাতা - মৃণাল সেন	দীপক ভট্টাচার্য	৫-৭
৪।	কিছু কথা : কিছু গল্প, এক কদম এগিয়ে দুই কদম পিছিয়ে !	ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক	৮-৯
৫।	রহস্য রোমাঞ্চে মোড়া ছবিকথা	প্রাণময় সাহা	১০-১৩
৬।	পূবের অবরুদ্ধ সিংহ দুয়ার !	ধ্রুব রঞ্জন সেন	১৪-১৬
৭।	জল পুরাণ	তাপস দেবনাথ	১৭-২০
৮।	ডাইরীর ছেঁড়া পাতা	নন্দিতা দত্ত	২১
৯।	জীবন তুমি পাশে থেকো	শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য	২২

রোমন্থন

১।	পুজো পরদেশে, পরবাসে	শক্তি দত্ত রায়	২৩-২৫
২।	কোশীনদীর ওপাড় থেকে...	নবেন্দু পাল	২৬-২৭
৩।	বিলেতের টুকিটাকি	দিবাকর দেবনাথ	২৮-২৯
৪।	‘এন ইভিনিং ইন প্যারিস’	সরযূ চক্রবর্তী	৩০
৫।	মনে পড়ে সেই সব দিন	অজয় ভট্টাচার্য	৩১-৩২

অণুগল্প/ছোট গল্প/রম্য গল্প

১।	পাপ !	সীপা দাস	৩৩-৩৪
২।	১০৯ নম্বর যাত্রী	বিল্লাল হোসেন	৩৫-৩৬
৩।	দর্পচূর্ণ	পারিজাত দত্ত	৩৭
৪।	এক ইউরোর কড়চা	অর্জুন শর্মা	৩৮-৪০

কবিতা

১।	দিনকাল	কল্যাণব্রত চক্রবর্তী	৪১
২।	স্বর্গ আমার চাই না	বিজন বোস	৪১
৩।	বাজুক বসন্তের গান	মানিক ধর	৪২
৪।	ওয়ান্ট জাস্টিস	সমীর ধর	৪৩
৫।	কথামালা	শুভাশিস চৌধুরী	৪৩
৬।	নাবিক জন্ম	অশোক দেব	৪৪
৭।	বসন্ত প্রলাপ	শুভম বনিক	৪৪
৮।	একটি শব্দ, অনেক আওয়াজ	আকবর আহমেদ	৪৫
৯।	কাউালান্দা	প্রদীপ মুড়াসিং	৪৬
১০।	নীরা তোমার জন্য	অরূপ হালদাব	৪৭
১১।	. প্রভেদ নেই	সঙ্ঘমিত্রা নিয়োগী	৪৮
১২।	উদযাপনের ঘুড়ি	চন্দ্রিমা সরকার	৪৮
১৩।	বিশ্বাসী নই, তবুও	শংকর ভট্টাচার্য	৪৯
১৪।	দুর্গাপূজা	দেবদুলাল চক্রবর্তী	৪৯
১৫।	অনুবাদ কবিতা	রামেশ্বর ভট্টাচার্য	৫০

হেপাগাথা

১।	নেশা গ্রাসে আমাদের দেশ ও আমাদের ত্রিপুরা	সুব্রত মজুমদার	৫১-৫৩
২।	পথভ্রষ্ট নতুন প্রজন্মে মারণ ব্যাধির আক্রমন ও উত্তোরণের পথ	ডাঃ কমল রিয়াং	৫৪
৩।	ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	ডাঃ দেবাশীষ দাস	৫৫-৫৬
৪।	Present scenario of drug addiction - an overview	Subrata Das	৫৭-৬১
৫।	এই সময় ও আমরা	পার্থপ্রতিম সাহা	৬২
৬।	আগামীর কর্মপথ	ডাঃ অভিজিৎ দত্ত	৬৩
৭।	সুস্থ মন সুস্থ দেহ উৎসব হোক আনন্দবহ	প্রিয়া দত্ত	৬৪
৮।	মা দুর্গা	রীটন দেববর্মা	৬৫
৯।	বীরগাথা	অমিতাভ দাশ	৬৬

বেলুড় মঠে শারদীয়া দুর্গা আরাধনা ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ, বিবেকনগর।

"দুর্গাং দেবী শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।।

১৯০১ সালের অক্টোবর মাস। আজ থেকে ১২৩ বছর আগে বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা করেন স্বামী বিবেকানন্দ । স্বামীজীর এক গুরু ভ্রাতা স্বপ্নে দেখেন ঐ বছর দূর্গা পূজার দশ বারো দিন পূর্বে দক্ষিণেশ্বর থেকে মা দশভূজা গঙ্গার উপর দিয়ে বেলুড় মঠের দিকে আসছেন ! এই কথা শুনে স্বামীজি তখনই বললেন যে রূপে হোক এবার বেলুড় মঠে পুজো করতেই হবে। সেদিনই তিনি স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালকে বাগবাজারে মা সারদা দেবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনার জন্য পাঠালেন। মা সারদা দেবীর আগমনী বার্তা শুনে অনুমতিতো দিলেনই সেই সঙ্গে পূজায় তাঁর নামে সংকল্পের অনুমতিও দিলেন। বৈদিক পূজা অনুষ্ঠানে সংকল্প আদি কোন সন্নাসীর দ্বারা হওয়া উচিত নয়, কারণ তাঁরা আত্ম শ্রাদ্ধ ও বিরাজা হোম এর মাধ্যমে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সেই কারণেই মাসারদা তাঁর নামে সংকল্প করার পরামর্শ দেন। সেই ধারা আজও প্রবাহমান। ওই দিনই কুমোরটুলিতে প্রতিমার বায়না দিয়ে মঠে ফিরে সবিস্তার স্বামীজিকে সেই সুসংবাদ জানানো হয়েছিল।

স্বামীজীর পূজা করবার কথা সর্বত্র নিমেষে প্রচার হলো। হাতে মাত্র ১০-১২দিন বাকি। তাতে কী হয়েছে, ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণ তা শুনে পূজা আয়োজনে আনন্দে যোগদানে রত হয়ে উঠলেন। এরই মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থার দায় পড়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এর উপর। পূজার দায়িত্ব পেলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল, তন্ত্র ধারক হন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বামীজীর গৃহী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী কলকাতা থেকে প্রতি রবিবার বেলুড় মঠে আসেন স্বামীজিকে দর্শন করতে। তিনি মঠের দুর্গাপূজার কথা শুনে আশ্চার্য হলেন কারণ ৪-৫ মাস পূর্বে তিনি যখন স্বামীজীর কাছে এক রবিবারে এসেছিলেন তখন স্বামীজি একান্তে তাকে আদেশ করেন "ওরে আগামী রবিবার যখন আসবি একখানা রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্ব শীঘ্র কিনে আমার জন্য নিয়ে আসবি"। শুনে ! প্রশ্ন করেন শরৎচন্দ্রবাবু, কি করিবেন মহারাজ? তখন স্বামীজি বলেন এবারমঠে দুর্গোৎসব করার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি খরচা সংকুলান হয় তো মহামায়ার পুজো করবো। তাই দুর্গোৎসব বিধি পড়ার ইচ্ছে হয়েছে। তুমি ওই পুথিখানি সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। পরের রবিবার পুস্তক ক্রয় করে স্বামীজীর হাতে দিলে তিনি পুস্তকটি পেয়ে খুবই খুশি হলেন। ওই দিনই পড়া আরম্ভ করে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থখানি পাঠ সমাপ্ত করেন।

প্রতি রবিবারের মতো গুরু দর্শনে এসে দেখা হতেই স্বামীজি বললেন, "তোর দেওয়া রঘুনন্দনের স্মৃতিখানি সব পড়ে ফেলেছি যদি পারি তো এবার মার পূজো করবো এমনকি রঘুনন্দন বলেছেন "নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম" মার ইচ্ছা হলে তাও করব। অর্থাৎ নবমী পূজার দিন মঠে ছাগ বলি প্রদান করব। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীর হাতে ওই পুস্তকটি দেওয়ার পর চার-পাঁচ মাস কারো সঙ্গে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি, আমি এই ব্যাপারে আর কখনো কারো সঙ্গে এমনকি স্বামীজির সঙ্গেও আলোচনা করিনি। তিনিও কখনো এই বিষয়ে আর আমাকে দূর্গা পূজার সম্বন্ধে কিছু বলেননি। তাই সেই কারণে তাঁর কাছে এটি আশ্চার্য ঘটনাবলী মনে হয়েছিল।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মা সারদা দেবীকে বেলুড় মঠে আনার জন্য মঠের দক্ষিণ দিকে নীলাম্বর বাবুর বাড়িটি এক মাসের জন্য ভাড়া করা হয়। বর্তমানে স্বামীজীর সমাধি মন্দিরের সম্মুখে বিল্ববৃক্ষের নিচে বসে কোন সময় স্বামীজি সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। সংগীতটি ছিল, গিরি গনেশ আমার শুভকারি, বিল্ববৃক্ষ মূলে পাতিয়া বোধন গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন গানটি।

ষষ্ঠী পূজোর বোধনের দু'দিন পূর্বে মঠের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দগণ নৌকো করে বাগবাজারের কুমোরটুলি থেকে মা দুর্গার প্রতিমা যখন মঠে নিয়ে আসা হয় তখন আকাশ ছিল ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। তড়িঘড়ি ঠাকুরের মন্দিরের নিচের তলায় মূর্তি রাখা মাত্রই আকাশ ভেঙে অবিশ্রান্ত বর্ষণ শুরু হয়। কিন্তু এই বৃষ্টিতে কোন ক্ষতি হয়নি দেখে স্বামীজি নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। ওই বছর পুরানো মন্দিরের সম্মুখে মন্ডপ তৈরি করে পূজা হয়। দুর্গাপূজায় সাক্ষাৎ মা সারদা দেবীর উপস্থিতিতে ভাগীরথী তীরে সুললিতসংগীত তরঙ্গ গঙ্গার পবিত্র পরিবেশে ঢাকঢোল এর ধ্বনি, গরিব দুঃখীর মহাপ্রসাদ ভোজনে চারিটিদিন মঠের প্রাঙ্গণে আনন্দের প্রবাহে অবগাহন করেছিল বেলুড় মঠ সম্মিলিত গ্রামগুলি।

নবপত্রিকা গঙ্গা স্নানের মধ্য দিয়ে সেদিন বেলুড় মঠ প্রাঙ্গনে শ্রীদুর্গার আরাধনা শুরু হলো। মা সারদা দেবী সাক্ষী রূপে বিরাজ করেছিলেন। ওই বছর মা দুর্গা বোধনাদি পূজা স্বামীজীর সমাধি মন্দিরের সামনে বিল্ববৃক্ষতলে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এইভাবেই বেলুড় মঠে পূজার দিন পূজারী ও তন্ত্রধারক শ্রীমায়ের আদেশে পূজা নির্বাহিত হয়। তিনদিন ব্যাপী গরিব-দুঃখী, কাঙ্গাল-দরিদ্রদের ঈশ্বর জ্ঞানে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হয়। এছাড়া ওই বছর বেলুড়, বালি ও উত্তর পাড়া অঞ্চলের পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তারাও সকলে আনন্দে যোগদান করেন। মঠের পুজো দেখে তাদের মনের মধ্যে যে একটি বিদ্বেষ ছিল তা চিরকালের মতো দূর হয়ে যায়। মঠের সন্ন্যাসীদের যথার্থ হিন্দু সন্ন্যাসীর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন।

মহাষষ্ঠী মহাসপ্তমীর পর মহা অষ্টমীর দিন পূর্ব রাত্রিতে স্বামীজীর জ্বর হয়। ওই বৎসর মহা অষ্টমীর দিন নয় জন বালিকা কুমীরকে দেবীরূপে পূজা করা হয়। তার মধ্যে স্বামীজি একজনকে পূজা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে একজন করে কুমারি পূজার প্রচলন হয়ে আসছে। সন্ধি পূজায় স্বামীজি মহামায়ার শ্রী চরণে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মহা নবমীর দিন স্বামীজি সুস্থ ছিলেন। ঐরাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দূর্গাপূজা উপলক্ষে যে সমস্ত গান দক্ষিণেশ্বরে গাইতেন ও শুনতেন, তার দুই একটি সঙ্গীত স্বামীজি মহামায়া মন্ডপেপরিবেশন করে সকলকে মোহিত করে তোলেন।

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল নবমী পূজার দিন মহামায়ার সামনে ছাগ বলি দেবার, কিন্তু মা সারদা দেবী তা থেকে নিবৃত্ত করেন, কারণ মঠ সকলকে অভয় দেওয়ার স্থান। সেখানে প্রাণী হত্যা সঠিক নয়। পরবর্তীকালে শ্রীমা ভক্তমহলে বলেছিলেন, নরেন কি জানে আজ বেলুড় মঠে পূজায় একটি মাত্র ছাগ বলি দিতে চেয়েছে কিন্তু এমন দিন আসবে হাজার হাজার ভক্তের মানত করা ছাগ বলিতে গঙ্গার জল লাল হয়ে যাবে। তাই মানা করি।

মহাদশমীর সকালে ধুমধাম সহকারে পূজা শেষ হয়, ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতির পর মায়ের প্রতিমা বিসর্জনের পর্ব শুরু হয়। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের নৃত্য মা সারদা দেবী সকলের সঙ্গে আনন্দে উপভোগ করেন। কেউ কেউ তাঁকে অনুযোগ করেন প্রতিমার সামনে এইভাবে অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য করা সঠিক কিনা? শ্রীমা বলেন দেবীকে এইভাবেই সন্তুষ্ট করতে হয়। ওতে কোন দোষ হয় না। এরপর প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে শান্তিজলের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এভাবেই মা সারদা দেবী সংকল্পিত, ও স্বামীজী প্রবর্তিত প্রথম দূর্গা পূজার সূচনা পর্বের চিরসাক্ষী হয়ে রইল বেলুড় মঠ। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যতরকম পূজা হয়ে থাকে তা মা সারদা দেবীর নামে সংকল্প করা হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন বেলুড় মঠের নতুন ভাবধারা সম্পর্কে বেলুড় সহ আশপাশের গ্রামের মানুষের স্পষ্ট ধারনা ছিল না। কিন্তু স্বামীজীর দূর্গাপূজা সূচনার মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের মঠের প্রতি এক অনন্য ভক্তি শ্রদ্ধা পরম্পরা শুরু হয়ে যায়। স্বামীজির জীবনের শেষ ভাগেও সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠানে পূজা পদ্ধতির প্রতি আন্তরিক ও শ্রদ্ধার সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। যারা তাঁকে কেবলমাত্র বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করেন এই পূজা অনুষ্ঠান প্রভৃতি তাদের এখন হতে বিশেষ রূপে ভাবিবার বিষয় হয়েছিল। স্বামীজি তাই বলতেন, আমি শাস্ত্র মর্যাদা নষ্ট করতে আসি নাই পূর্ণ করতে আসিয়াছি - "I have come to fulfill and not to destroy".

"আমরা চাই সেই ধর্ম যা মানুষ তৈরি করে...। আমাদের চারদিকে যাঁরা আছেন তাঁদের পূজা সর্বাগ্রে প্রয়োজন...। এরাই আমাদের ভগবান। এবং প্রথম আমাদের যে দেবতাদের পূজা করতে হবে তাঁরা হলেন আমাদের স্বদেশবাসী।"

স্বামী বিবেকানন্দ।

বৌদ্ধ উৎসব

শ্রীমৎ কুশলায়ন ভিক্ষু। সোনামুড়া।

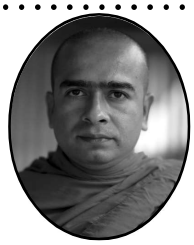

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

বৌদ্ধ উৎসবগুলো প্রধানত পূর্ণিমা কেন্দ্রিক। বিশেষ ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বুদ্ধ বিহারগুলোতে এই উৎসবগুলো পালিত হয়। মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ তার ধর্ম প্রচারের প্রারম্ভে কোনো উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। কিন্তু কালক্রমে সামাজিক ও ধর্মীয় উৎকর্ষ সাধন কল্পে উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সেই ধারাবাহিকতার সঙ্গে বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ এই ত্রিস্মৃতি বিজড়িত বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা। সিদ্ধার্থের মাতৃদেবীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণের স্মৃতি বিজড়িত আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বানর কর্তৃক বুদ্ধকে মধু দানের স্মৃতি বিজড়িত মধু পূর্ণিমা বা ভাদ্র পূর্ণিমা। আত্মশুদ্ধি আত্মসংযমের তিন মাস কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের পর আশ্বিনী বা প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান এক সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস বৌদ্ধ ভিক্ষুরা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা) বুদ্ধ বিহারে থেকে কঠোর ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করেন। সাধারণ বৌদ্ধ জনসাধারণও এই তিনমাস বুদ্ধ বিহারে গিয়ে 'অষ্টশীল নামক' ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করেন। তিন মাস বর্ষাব্রত সমাপনীতে আশ্বিনী পূর্ণিমার দিন প্রবারনা কর্ম সম্পাদন করেন। প্রবারনা মানে সকল অকুশল ভুল ভ্রান্তিকে বর্জন এবং সকল কুশল ও সুন্দরকে বরণ করা। প্রবারনা পূর্ণিমাকে ক্ষমা প্রার্থনা দিবসও বলা হয়। এই দিন একে অপরের কাছে নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোনো ভুল, ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে একে অপরকে ক্ষমা ও মৈত্রী দানের মধ্যদিয়ে এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়। প্রবারনার পর থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত বুদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান উৎসব শুরু হয়।

কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে ভিক্ষুসংঘকে চীবর অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্র দান করা হয়। বৌদ্ধদের বিশ্বাসমতে সমস্ত দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এ চীবর দান। 'চীবর' শব্দের অর্থ ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র বা কাপড়। গাছের শেকড়, গুঁড়ি, ছাল, শুকনো পাতা, ফুল ও ফলের রঙ অনুসারে এর ছয়টি রঙ নির্দিষ্ট। তবে ভিক্ষুসংঘ সাধারণত লাল ফুলের রঙের বস্ত্রই বেশি ব্যবহার করে। যা সাধারণ গৃহীদের পরিধেয় বস্ত্র থেকে পৃথক ও বৈচিত্র্যহীন।

কঠিন চীবর দান প্রচলনের পূর্বে ভিক্ষুসংঘ পাংসুকুলিক চীবর (শ্মশানে বা অন্য কোথাও পড়ে থাকা ময়লা ছিন্নবস্ত্র) পরিধান করত। এতে ভিক্ষুদের রোগাক্রান্ত হওয়া এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটার সম্ভাবনা থাকত। তাদের সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ দেহের কথা চিন্তা করে রাজগৃহে বর্ষাবাসকালে বুদ্ধদেব চীবর অর্থাৎ পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি দেন। গৃহীরা তাদের এ বস্ত্র দান করে। তবে সকল ভিক্ষুই চীবর পরিধান করতে পারেন না। যারা ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস সমাপ্ত করেছে কেবল তারাই চীবর ব্যবহার করতে পারেন। প্রবারনা পূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমার পূর্ব পর্যন্ত একমাস ব্যাপী এ চীবর দান অনুষ্ঠান পালিত হয়।

'চীবর দান' কথাটির সঙ্গে 'কঠিন' শব্দটি যুক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে মহাবগ্গ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যেদিন চীবর দান করা হবে সেদিনের সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সুতাকাটা, কাপড় বোনা, কাপড় কাটা, সেলাই ও রঙ করা, ধৌত করা ও শুকানো এ কাজগুলি সম্পন্ন করে উক্ত সময়ের মধ্যেই এ চীবর ভিক্ষুসংঘকে দান করতে হবে। এছাড়া আরও কিছু নিয়ম-কানুন আছে, যা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের জন্যই পালন করা বেশ কঠিন। তাই এ অনুষ্ঠানের নাম হয়েছে 'কঠিন চীবর দান'।

চীবর দানের ফল সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শতবর্ষের দান কিংবা পৃথিবীর সকল প্রকার দান একত্র করলে তার যে ফল তা একখানি চীবর দানের ফলের ষোলো ভাগের এক ভাগও নয়। সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৌদ্ধদের জন্য চীবর দানের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দান জন্মজন্মান্তরে সুফল প্রদায়ী।

প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে বছরে একবার মাত্র এ চীবর দান করা হয়। এদিন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ গৃহীরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর দান করে। ভিক্ষুসংঘও তাদের বিনয়-বিধানেব

. সকল নিয়ম অক্ষুণ্ণ রেখে পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে এ চীবর গ্রহণ ও ব্যবহার করেন।

কঠিন চীবর অনুষ্ঠানের দিন বিহারে ও গৃহে আনন্দ উৎসব চলে। ঘরে নানা ধরণের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়। বিহারকে নানা রঙে সাজানো হয়। এমনকি গ্রামের রাস্তাগুলোকেও নানা রঙিন কাগজ ও ধর্মীয় পতাকায় সাজানো হয়। সেদিন সকাল থেকে গ্রাম ও বিহার যেন উৎসব মুখর হয়। ছোট-বড় সবাই বিহারে যায়। ভোরে বিশ্ব শান্তি কামনায় পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ, ধর্মীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন, নানা বর্ণের গন্ধের পুষ্প, প্রদীপ, সুমিষ্ট পানীয় দ্বারা সমবেত বুদ্ধ পূজা করা হয়। বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রামগুলো থেকে বৌদ্ধ জনসাধারণ উপস্থিত হয়ে পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করেন। অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র সংঘের উদ্দেশ্যে সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান করা হয়। দুপুরে ভিক্ষুসংঘের আহারের পর দূরাগত অতিথিদের আহার প্রদান করেন গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকরা। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা, নতুন পোশাক পরিধান করে বুদ্ধ কীর্তন সহকারে পবিত্র চীবর, মঙ্গল ঘট মাথায় নিয়ে নগর

পরিভ্রমণ করে বুদ্ধ বিহারে আসেন। বিকেলে মঙ্গলাচরণ, উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে কঠিন চীবর দানের তাৎপর্যের ওপর ধর্মালোচনা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ভিক্ষুসংঘের পাশাপাশি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হন। এতে ভিক্ষুসংঘ ও অতিথিগণ ধর্মের নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। যা ভক্তরা অধীর আগ্রহে মনোযোগে শ্রবণ করে শিক্ষা লাভ করে সাধুবাদে ধন্য হোন। সন্ধ্যায় সমবেত হয়ে কঠিন চীবর দান উৎসর্গ শেষে জগতের সকল প্রাণীর সুখের জন্যে জল ঢেলে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষ হয়। সন্ধ্যায় হাজার প্রদীপ জ্বালানো হয়। দেশ ও বিশ্বের শান্তি কামনায় সমবেত প্রার্থনা করা হয়। এর পর ফানুস উড্ডয়ন করা হয়। এতে ছোট-বড়, নবীন-প্রবীন সকলে আনন্দে মেতে ওঠে। রাতে কীর্তন ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নানা রকম বাদ্যবাজনার তালে তালে, সংকীর্তনের ঝংকারে নেচে-গেয়ে বর্ণিল ফানুস আকাশে ওড়ানো হয়। রাতে এ দৃশ্য অপূর্ব মনে হয়। এটি আজ শুধু ধর্মীয় বিষয় নয় অন্যতম সামাজিক উৎসব। উৎসবগুলোতে সমবেত সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠে।

With Best Compliments from :-

Renuka Medical Agency

(Wholesale Distributer)

Nehru Super Market

Room No. 9 (Ground Floor)

Udaipur, Gomati District, Tripura.

Mobile : 8974891276

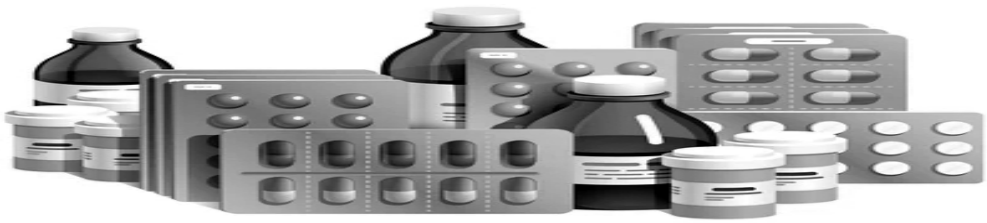

ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র নির্মাতা — মৃণাল সেন

দীপক ভট্টাচার্য। আগরতলা।

ভারতীয় নব্যধারার চলচ্চিত্র চর্চার ইতিহাস যে সকল মহান চলচ্চিত্র স্রষ্টার অংশগ্রহণে উজ্জ্বল হয়েছে মৃণাল সেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। হলিউড প্রবর্তিত তারকা নির্ভর চলচ্চিত্র সৃষ্টির ধারা একটা সময় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণে তাদের কথা বলার ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র নির্মাণের বিপরীত ধারার পক্ষে সর্জেই আইজেনষ্টাইন, পুদভকিন প্রমুখ স্রষ্টাগণ যে চলচ্চিত্র শৈলীর নির্মাণ করেছিলেন তার প্রভাব আমাদের তখনকার নবীন চলচ্চিত্রকারদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছিল। সেই ধারার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সত্যজিৎ রায়ের অমর চলচ্চিত্র ‘পথের পাঁচালীতে’। পরবর্তী সময় যে ছবির প্রভাবে আরো অনেক প্রভাবশালী স্রষ্টা বাঙলা ভাষা সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ছবি নির্মাণ করে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের এই প্রচেষ্টা যদিও তারকা প্রবর্তিত ধারাকে ব্যাহত করতে পারেনি কিন্তু একটা সমান্তরাল অন্যধারার ছবি নির্মাণের ক্ষেত্র তৈরী করতে পেরেছে। যে ধারার হাত ধরে শুধুমাত্র বাঙালী চলচ্চিত্র পরিচালক নন দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রও ভীষণভাবে উদ্বেলিত হয়েছে। যাদের মধ্যে বিশেষভাবে মালায়ালিম ভাষার চলচ্চিত্র উজ্জ্বলতার সাক্ষর রেখেছে। সংখ্যায় কম হলেও কন্নড় ছবিও খুব সম্প্রতি ‘ভেনিস’ উৎসবে পুনঃপ্রদর্শিত হয়ে প্রশংসিত হয়েছে। মারাঠী ছবিও খুব একটা পিছিয়ে নেই। ব্যতিক্রমী ছবি বেশ কিছু হিন্দীতেও নির্মাণ হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে ‘মন্থন’ এক অনন্য চলচ্চিত্র। যেখানে সাধারণ মানুষ বেশীরভাগই গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের সক্রিয় অংশীদারিত্বে এই ছবিটি নির্মিত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর সেই ছবিটির একটি পুনোরুদ্ধার করা প্রিন্টকে ডিজিটাইজ করে ‘কান’ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। মানুষের অংশগ্রহণে নির্মিত ছবি শুধু ব্যতিক্রমীই নয়। মানুষের ভালোবাসায় চিরকালীন হয়ে যায় এগুলো তারই প্রমাণ বহন করে। এই ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের ঢেউ উত্তর পূর্বাঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসাম একমাত্র রাজ্য যেখানে চলচ্চিত্র নির্মানের সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিভাগের সৃষ্টিশীল মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। আসামে চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তন ঘটেছিল জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার হাত ধরে। এরপর মনিপুরের কথা এসে যায়। যেখানে সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মানুষের অবদান শুধু চলচ্চিত্র নয় অন্য সব সৃষ্টিশীল কাণ্ডেরও বেশ জগৎ জোড়া নাম রয়েছে। ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র নিয়ে জগৎসভায় মনিপুরের উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটিয়েছিলেন অরিবাম শ্যামশর্মা। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আদিবাসীদের অংশগ্রহণে যে সকল চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে সে সবই ব্যতিক্রমী ধারার অন্তর্গত। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘লংতরাই’, ‘ওসোবিপু’, ‘হাগরা জানি জাও’, ‘মানিক রাইতং’ আরো অল্প কিছু ছবি। যদিও ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরবর্তী প্রদর্শন ব্যবস্থা ভীষণভাবে কন্টকাকীর্ণ তথাপি মানুষ তার সৃষ্টির কাজ বন্ধ রাখতে পারে না বলে অন্যধারার ছবি তৈরীর সংখ্যা যথেষ্ট কমে গেলেও একদম বন্ধ হয়ে যায়নি। কত ভালো ছবি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবস্থার স্বীকার হয়ে যে আজো দর্শকের দরবারে পৌঁছুতে পারেনি সে হিসাব কে রাখে। ঋত্বিক ঘটকের ‘নাগরিক’ ছবিও তেমনি বহুবছর বাক্সবন্দী হয়েছিল। চলচ্চিত্রটি মানুষ দেখতে পেয়েছিল তার নির্মাণের পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পর। অথচ ভারতীয় চলচ্চিত্রে ব্যতিক্রমী ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে আজো তিনি অন্যতম বলে স্বীকৃত। বাঙলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সাহায্যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম আদায় করে নিতে যাদের সৃষ্টি সহায়ক হয়েছিল গোড়ার দিকের সেই ত্রয়ীর অন্যতম ছিলেন মৃণাল সেন।

মৃণাল সেন নানা ধরণের বিষয় কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে গেছেন। যদিও তাঁর কৃতিত্ব বেশী করে আলোচিত হয়ে থাকে নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের মানবিকতা ও তার সমস্যাদীর্ণ জীবনের ঘটনাবলি বর্ণিত চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে। সত্তরের দশক বাঙলাভাষী মানুষের

জন্য মুক্তির দশক হয়ে এসেছিল। একদিকে বাঙালী সে সম্ভাবনা পূর্ণ করে এক নতুন দেশের জন্ম দিয়েছে। আর এই দেশের বাঙালী যুবক সেই স্বপ্নের পেছনে হেটে, হেটে ক্লান্ত হয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের গোলকধাঁধাঁয় হারিয়ে যায়। নগরকেন্দ্রিক আরো নির্দ্দিষ্ট করে বললে কলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজের সেই উত্তাল সময়ের টানা-পোড়োনে জীবন্ত হয়ে রয়েছে তার ছবিগুলো। যেগুলোতে ধরা পড়ে মধ্যবিত্তের শিড়দাঁরা সেই সময় থেকে আজ কিভাবে নুয়ে প্রায় মাটিতে মিশেই গেছে। অন্যধারার এই চলচ্চিত্র থেকে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও আলোচনা মানব সভ্যতার আধুনিক অগ্রগতির রূপরেখা বুঝতে সাহায্য করে। খুবই কম বাজেটের সাদা-কালোয় তৈরী হওয়া সেসব ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে 'কলকাতা-৭১', 'পদাতিক', 'ইন্টারভিও' প্রভৃতি। যা থেকে যুব সমাজের মানসিক বিবর্তনের একটা ছবিও ধরা পড়ে। এই সকল চলচ্চিত্র সর্ম্পকে কিছু সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে মৃণাল সেন রাজনৈতিক সিনেমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং দশ বছর ধরে সিনেমার ফর্ম নিয়ে গবেষণা করে তিনি অভূতপূর্বভাবে গল্পের সাহায্যে নিপীড়িত মানুষের সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। তার এই বক্তব্যের সমর্থনে 'খারিজ', 'আকালের সন্ধানে'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। যদিও রাজনৈতিক সিনেমা কথাটা বিতর্কিত কারণ প্রকৃত অর্থে প্রতিটি সিনেমাই ভীষণভাবে রাজনৈতিক। কোনটা পক্ষে তা উপলব্ধি করে নিতে হয়। পরবর্তী সময় হিন্দীতে গুটিকয়েক এই ধরণের চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে যা অনেকাংশে মৃণাল সেনের ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রগুলো থেকে প্রভাবিত হয়েছিল মনে করা হয়। এছাড়া যে ছবিটি নিয়ে আজো তিনি চর্চিত হয়ে থাকেন চলচ্চিত্র বোদ্ধা থেকে শুরু করে সাধারণ চলচ্চিত্র দর্শক সমাজে হিন্দী ভাষায় তৈরী সে ছবির নাম 'ভুবন সোম'। উৎপল দত্ত ও সুহাসিনী মূলের অনবদ্য অভিনয় ছবিটির এক সম্পদ। একজন কঠোর ও দাপুটে রেলকর্তা ভুবন সোমকে সহজ, সরল গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রামীণ সরলতা ধীরে ধীরে ভালোবাসায় কোমল হয়ে উঠতে সাহায্য করে। আবার 'পরশুরাম' ছবিতে একদম পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা বলেছেন। আবার 'আকালের সন্ধানে' ছবিতে মানব সৃষ্ট কৃত্রিম খাদ্যসঙ্কটে মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন চিত্রায়িত হয়েছে। যা এক অনবদ্য দলিল হয়ে আছে। এই ছবিতে তিনি সিনেমার ভেতর সিনেমার গল্পে কাহিনীর বিন্যাস ঘটিয়েছেন। শেষের দিকে ছবি 'যেমন' অন্তরীণ-এ তিনি হিন্দী ছবির প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে নিয়ে কাজ করেছেন, হয়তঃ প্রদর্শন ব্যবস্থার একতরফা কর্তৃত্বের সঙ্গে কিছুটা আপোষ করেই। প্রদর্শন ব্যবস্থার এই একচেটিয়া মনোভাবের সঙ্গে নিরন্তর পরাস্ত হওয়া ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র সমূহকে দর্শকের সন্মুখে প্রকাশিত করার লক্ষ্যে গত শতাব্দীর আটের দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি আধুনিক প্রদর্শন কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল । সত্যজিৎ রায় যার নামকরণ করেছিলেন 'নন্দন'। ভারতীয় ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই নন্দন। যা প্রতিনিয়ত সেই সব ছবির প্রদর্শনীতে মুখরিত হয়ে থাকতো যেগুলো সাধারণ প্রেমাগৃহে ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রদর্শিত হতে পারতো না। বর্তমান পরিস্থিতিতে 'নন্দন' ও তার গরিমা ধরে রাখতে পারছেনা। যে কারণে ব্যতিক্রমী ছবি প্রদর্শনের কেন্দ্রতেও এখন অন্যধারার ছবিকে সম্পূর্ণ অলীক ও বাস্তববর্জিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। অর্থ ও সংঘবদ্ধ ব্যবসায়িক কূটকাচালির কাছে সাধারণ মানুষের সাহায্যে তৈরী হওয়া ছবিগুলো একদিন হারিয়ে যায়। এই ঘটনা একজন অন্যধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাকে ক্রমশঃ হতোদ্যম করে দেয়। অন্যধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল থাকে না। ঋত্বিক ঘটকের তো ছিলই না। মৃণাল সেনেরও ছিল না। সত্যজিৎ রায় নিজেই বলে গেছেন যে তাঁর 'ফেলুদা' সিরিজের বইগুলোর রয়েলিটিই তাঁকে সচল থাকতে সাহায্য করেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে চাকচিক্য ও জৌলুচের যে ছবি প্রতিনিয়ত প্রচারিত হয়ে থাকে তা প্রধানত হলিউড ধারার অলীক কল্পনাবিলাসী চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্রে গড়ে ওঠে প্রকৃতপক্ষে যা এক সংঘবদ্ধ ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা মাত্র। প্রকৃত চলচ্চিত্র স্রষ্টা যাদের কীর্তি আজো মহান সৃষ্টির অন্তর্গত হয়ে রয়েছে সারা বিশ্বে, তাদের প্রতিনিয়ত সেই সংঘবদ্ধ পদ্ধতির মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হয় বলে তথাকথিত বিত্তবানের পর্যায়ে তারা নিজেদের দেখতে পান না। যদিও মানুষের হৃদয়ে তাঁরা ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র কর্মকাণ্ডের জন্য সমাদৃত হয়ে থাকেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব মানুষের

. শারীরিক অসুস্থতার সময় ঠাঁই হয় সরকারী হাসপাতালে। মৃণাল সেন শেষ জীবনে একা কয়েকজন সেবিকা নির্ভর জীবন কাটিয়েছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি আক্ষেপ করে গেছেন কথা বলার লোক পান না বলে। একাকীত্ব তাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছিল। আসলে তিনি বুঝতে পারেনা যে তাঁর সঙ্গে কথা বলার মত মানুষই ক্রমশ কমে যাচ্ছে এই পৃথিবীতে। এখন চারদিকে প্রচুর মানুষ তথাপি কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার মত লোকের বড়ই অভাব। অদ্ভুতভাবে সবাই বিজ্ঞাপিত জীবনের খোঁজে ছুটছে। ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র যেখানে সমাজের কথা বলে সংঘবদ্ধ জীবনের কথা বলে সেখানে আধুনিক এই সময়ের জীবন ধারা একদম বেমানান। যে কারণে শুধু মৃণাল সেন নন এখন কথা বলার লোক দ্রুত কমে যাচ্ছে এই উপলব্ধি আরো অনেক সৃষ্টিশীল মানুষের মনের কথা। মৃণাল সেন কথা বলতে ভালোবাসতেন তা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রে তিনি পরিমিত সংলাপই ব্যবহার করেছেন। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত ভালোবাসা প্রভাব ফেলতে পারেনি। মৃণাল সেনের সঙ্গে শেষ হয়ে গেল ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র সৃষ্টির 'পুরোধা ত্রয়ী'র তৃতীয় স্রষ্টা। তবে তিনি রেখে গেছেন অমূল্য সব সৃষ্টি যা আজ চলচ্চিত্রের একনিষ্ঠ ছাত্রের কাছে অবশ্য পড়ার, জানার বস্তু হয়ে রয়েছে। এই ভাবেই উত্তরসূরীদের কাজের মধ্যে তাদের সৃষ্টির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

মৃণাল সেন পরবর্তী ব্যতিক্রমী ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ ক্ষেত্রটি খুবই ক্লিশে হয়ে গেছে। এই সময় হাতে গোনা দু'য়েকজন ছাড়া বাংলাভাষায় অন্যধারার ছবি নির্মাণের সাহস বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না অথচ এই বাঙলা থেকেই ব্যতিক্রমী ত্রয়ীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বিশ্বমানের ছবি নির্মাণ করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে গর্বিত করেছেন এমন বেশ কিছু প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারের দেখা মিলেছিল। এই ত্রয়ীর প্রভাব নিঃসন্দেহে অন্য চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্রকারদের প্রভাবিত করেছিল। আমাদের মধ্যে আদিবাসী জীবন নির্ভর ছবি করার ভাবনা তাদের ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রভাবমুক্ত ছিল একথা কি বলা যায়? প্রভাবিত হওয়ার জন্য ব্যক্তিগত আলাপচারিতা যদিও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তথাপি আমাদের আদিবাসীদের দিয়ে ওদের জীবন নির্ভর চলচ্চিত্র জুমিয়া কৃষকদের দ্বারা অভিনীত হয়েছে একথা তাঁকে এখানকার ছবি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করেছিল। এমনিতেও ত্রিপুরা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল। সেকথা তাঁর 'প্রসঙ্গ ত্রিপুরা' চলচ্চিত্র তৈরীর ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায়।

মৃণাল সেন

ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র নির্মাণের যে ধারা সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছিল যা থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলও ব্যতিক্রম ছিল না, দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই ধারার গতি নব্বইয়ের দশকের পর থেকে ক্রমশঃ পথ হারিয়ে এখন চোরাবালিতে ঢুকে পড়েছে। সেই চোরাবালি কেটে বেরুতে হলে মৃণাল সেনদের চলচ্চিত্র নির্মাণ শৈলীর কাছে ফিরে যেতে হবে। ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র সৃষ্টির পুরোধা ব্যক্তিত্বের অন্যতম মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র সৃষ্টির সেখানেই সার্থকতা। যা কোনভাবেই তথাকথিত বক্স অফিস সফলতার মুখাপেক্ষী নয়।

" তুমি ভাল আছো ? আমি ভালো নেই"।
মৃণাল সেন।

কিছু কথা ঃ কিছু গল্প
এক কদম এগিয়ে দুই কদম পিছিয়ে!

ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক। আগরতলা।

গল্প ১ ঃ ট্রেন যাত্রা

দিন কয়েক আগে এক সহযাত্রীকে নিয়ে ট্রেনে ধর্মনগর থেকে আগরতলা ফিরছি। রিজার্ভেশন কোচ। কুমারঘাট থেকে এক ভদ্রলোক উঠলেন। উঠেই মোবাইলে ক্রমাগত বিহারী হিন্দিতে কথা বলে যাচ্ছেন। যা শ্রুতিমধুরও নয়। ভদ্রলোককে দেখতে মধ্যবিত্তই মনে হচ্ছিল। উঠে বসেই জুতো খুলে ফেললেন। মোজাগুলো পায়েই ছিল। হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর গন্ধে চারদিক দুর্গন্ধময় হয়ে উঠলো। তাতে অবশ্য ভদ্রলোকের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কথা বলছেন আর গন্ধ ছড়াচ্ছেন। আমার পাশে আর একজন মাত্র সহযোগী ছিলেন। উনিতো ট্রেনে বসেই সটান ঘুমে। এবার বিহারীবাবুর পদযুগল নিঃসৃত দুর্গন্ধ আমাকেই উপভোগ করতে হচ্ছিলো। কয়েকবার মনে মনে চেষ্টা করলাম বিহারীবাবুকে বলি আপনার জুতোটা পরে নিন। অথবা মোজা বর্জন করে পদযুগল স্যানিটাইজ করুন। পরক্ষণেই ভাবলাম না এটা ঠিক হবেনা। কিন্তু দুর্গন্ধও সহ্য হচ্ছিল না। এবারে একটু বেরিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে এসে দেখি বদ গন্ধটা আরো বেশি অনুভূত হচ্ছে। এবার ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুমও আসছে না। নিজেকে বললাম এতটা সৎ সাহসের অভাব কেন? চলো লোকটাকে একটা খিস্তি দিয়ে বলি এখান থেকে উঠে যেতে। অনেকটা এগিয়ে গেলাম। তারপরে আবার পিছিয়ে এসে নিজের জায়গায় বসে পরলাম। অনেকক্ষন ছায়া যুদ্ধের পর যোগেন্দ্রনগর স্টেশান এলো। বিহারীবাবু নেমে গেলেন সেখানে। ভাবলাম ভালোই হলো। কিন্তু একটা অজানা অপরাধবোধ আমাকে তাড়া করছিলো। পরবর্তী কয়েকদিন একথা ভেবে কাজেও তেমনভাবে মন বসাতে পারছিলাম না। আমরা তথাকথিত সমাজ সচেতন ব্যাক্তি? কিন্তু সাহস করে অতি সামান্য একটা কথা বলতে পারলাম না। সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়বোধ থেকে কি বিচ্যুত হলাম ? মাঝে মাঝেই এটা ভেবে অজানা অপরাধ বোধের গ্লানিতে ভারাক্রান্ত হচ্ছি।

গল্প ২ ঃ তিলোত্তমা

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে! এটা কবির স্বপ্ন বিলাস না বাস্তববোধ জানিনা? কিন্তু সম্প্রতি তিলোত্তমা চলে গেল! ৯ আগষ্ট রাতে তিলোত্তমা যখন এই দানবীয় পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো তখন তার হৃদয়ে আমাদের সভ্য সমাজের প্রতি রাগ, অভিমান না ঘৃনা ছিল জানিনা। নাকি সে শূন্যহৃদয়া হয়ে গেছিল তাও জানিনা। মায়ের কাছে শেষ ফোন কল। তারপরের গল্প সবার জানা। দূরদর্শন, সোশ্যাল মিডিয়ার দাপাদাপি, চিৎকার, চেঁচামেচি, রাতের আন্দোলন, দিনের আন্দোলন, কত নিত্য নতুন প্রতিবাদের ভাষা, আরো কত কি। রাজনীতি হলো। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ভেতরের নগ্ন চেহারা জন সমক্ষ্যে উন্মোচিত হলো। ব্যক্তিগত আক্রমণ হলো, কলেজ ভাঙা হলো, গাড়ি ভাঙা হলো, ব্যারিকেট ভাঙা হলো, কিন্তু তিলোত্তমা কি পেল? কি পেল একমাত্র সন্তানহীন মা বাবা? কি পেল সত্যিকারের বন্ধুরা যারা তথাকথিত ধর্ণা আর আন্দোলন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কেবল চোখের জল ফেলে গেল দিনের পর দিন? আর অজানা ভয়ে ভাবছে কি হবে তাঁদের ভবিষৎ?

বিনা কারণে কাউকে অভিযুক্ত করে দূরে দাঁড়িয়ে আন্দোলনের জয় হয়েছে বলে হাত তালি দেবে? আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ কান্ডে যুক্ত বিখ্যাত বা কুখ্যাত ব্যক্তি যাদেরকে টার্গেট করা হয়েছে করাপশনের চার্জে, কেবলমাত্র আসল ঘটনা থেকে নারকীয় হত্যালীলা চালানো খুনিদেরকে আড়াল করার জন্য?

একদল ছদ্মবেশী রাজনৈতিক দালালদের প্রচেষ্টায় চারদিনের মধ্যে পুরো ঘটনাটা সুকৌশলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সি.বি.আইয়ের হার্ড ডিস্কে। বিশ্ব বিখ্যাত লাল বাজার পুলিশ একটা বখাটে এজেন্টকে জেলে পুরে দেখিয়ে দিল কেল্লা ফতে। তারপর আবার পিছনে হাঁটার শুরু। ফরেনসিক মেডিসিনের প্রথম পর্বে লেখা আছে এতো বড় ঘটনা একজন ব্যক্তি করতে পারে না। আরো অনেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল? সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন আর ভারত বিখ্যাত গোয়েন্দারা কেবল গোল গোল ঘুরছেন? সত্যিই বিচিত্র এই দেশ! "তিলোত্তমা" ঘটনার নৃশংশতা পুরো বিশ্বের মানুষকে নাড়িয়ে দিল। আর আসল খুনি আর চক্রান্তকারীরা এত সাহসী, এত শক্তিশালী যে তাঁদের কিছুই

হলোনা। হে"তিলোত্তমা" তুমি কিন্তু ক্ষমা করোনা আমাদের দুর্বলতাকে, আমাদের এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে যাবার দুর্বল মানসিকতাকে।

"তিলোত্তমা" আজ শুধুমাত্র আর আর,জি,করের নয়, কলকাতার নয়, পুরো দেশের, পৃথিবীর হৃদয়বান মানুষ্যত্বের প্রাণের আকুতি। তাই যতই রাজনীতি হোক, যতই এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে যাবার প্রচেষ্টা থাকুক--- তিলোত্তমাকে ন্যায় পেতেই হবে। কারণ এক তিলোত্তমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ কোটি তিলোত্তমা। তার অপলক দৃষ্টি শুধুই দেখছে চোখ বাঁধা সেই নারীকে যিনি তুলাযন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছেন আবহমানকাল। জাস্টিস তাকে পেতেই হবে। যদি এর অন্যথা হয় তাহলে হয়তো গণদেবতা এ বিচারের ভার নিজের হাতেই তুলে নেবেন? তখন তাকে আটকানোর ক্ষমতা কারোর নেই। শেষের শুরু হয়ে গেছে।

গল্প ৩ ঃ নেশার পরিবারবাদ

কয়েকদিন আগের কথা। এক ভদ্রলোক উনার ছেলেকে নিয়ে এলেন জি,বি,হাসপাতালে। ছেলেটার এইডস এবং হেপাটাইটিস সি হয়েছে। বয়স ২১ বা ২২। কলেজ পদার্পন করে আর পড়তে যাওয়া হয়নি। বই ধরার আগেই ড্রাগের হাতেখড়ি হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম কি ড্রাগস নাও তুমি? বলল ব্রাউন সুগার। ছেলেটা ড্রাগের নেশাগ্রস্ত হলেও অকপটে এক ডোজের দাম কত, কোথায় পাওয়া যায়, কে দে, তার ফোন নাম্বার, কোথায় নেওয়া হয়, তার সাথে কারা কারা সিরিঞ্জ সূচ শেয়ার করে, সবই বলল। কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। বুদ্ধিমান ছেলে, তাই ও এটাও জানে এই ড্রাগ চক্রের পেছনে বড় মাথাগুলো কারা আছে। এ কারণে খুবই নিশ্চিন্ত যে তার কোনো অসুবিধা হবে না। এবার ওর সাথে একটু বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। সঙ্গে ওর বাবা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। কথা শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম তোর তো উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল নম্বর ছিল। কলেজে না গিয়ে সরাসরি কলেজের মাঠে চলে গেলি কেন? তোর ড্রাগ যাত্রার গুরু কে? ছাড়তে ইচ্ছে করে না? তার সঙ্গে বলা সবকথা এই ছোট্ট পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। তার বক্তব্যের সারমর্ম থেকে জানতে পারলাম এর পেছনে নেশায় আসক্ত বন্ধুদের একটা প্রচ্ছন্ন হাতছানি ছিলো। তবে আসল শুরুয়াৎ বাড়ি থেকে। বললো বাবা রোজ রাতেই মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসতেন। সেটা তার ভাল লাগতো না। কিন্তু তার দুঃখের কথা শোনার কেউ ছিলনা কারণ খুব ছোট বয়সেই মা মারা গেছেন। কলেজে উঠে হঠাৎ পাওয়া স্বাধীনতা তাকে নেশার পথে টেনে নিয়ে যায়। এখন সে ত্রিফলায় বিদ্ধ। প্রথমত ড্রাগের নেশা। দ্বিতীয়ত এইডস। তৃতীয়ত হেপাটাইটিস সি। সে জানে এমন অবস্থায় তার পক্ষে সংসার জীবন করা বা বেঁচে থাকা এক কঠিন লড়াই। সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এই মুহূর্তে তার ঠিক কি করণীয়। তার বাবাকেও বোঝালাম আপনি যে জীবন যাপন করছেন তাতে আপনারও লিভারসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ সংশয় দেখা দিতে পারে? তখন এই নেশাগ্রস্থ ছেলেকে কে দেখবে।কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ভদ্রলোক খুব বিনীত ভাবে বললেন স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমার মদে আসক্তি জন্মায়। অনেকবার ছাড়ার চেষ্টা করেছি, পেরে উঠিনি। আমার অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিন তিনটে মদের দোকান। সেগুলো আমাকে আকর্ষন করে। কিন্তু আজকে আপনার কথা শুনে আমার নতুন ভাবে বাঁচার ইচ্ছা জেগে উঠেছে। আমার প্রয়াত স্ত্রীর একমাত্র উত্তরাধিকার আমার ছেলেকে আমি সুস্থ করে তুলবই। এটা আমার প্রতিজ্ঞা।

তবে ডাক্তার বাবু আমার একটা প্রশ্ন আগে শহরে দুটো বা তিনটে মদের দোকান ছিল। এখন প্রতি পাড়ায় পাড়ায় দোকান হয়েছে। লাইনে দাঁড়িয়ে বাপ, বেটা মদ কিনছে। তাহলে কি মদ খারাপ জিনিস নয়? রেশন দোকান থেকেও মদের দোকানের সংখ্যা বাড়ছে কেন? আমি নিরুত্তর তার দিকে শুধু চেয়ে রইলাম।

রহস্য রোমাঞ্চে মোড়া ছবিকথা

প্রাণময় সাহা। অমরপুর।

অমরপুর থেকে দক্ষিণ মুখি হয়ে আপন গতিতে বহমান গোমতী নদী। শান্ত ধীর স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে। দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে মাত্র পক্ষ কাল আগে রুদ্ররূপ ধারণ করে হাজারো মানুষের সর্বস্ব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। উন্মত্ত গোমতী তছনছ করে দিয়ে গেছে গোটা অমরপুরকে। নাড়িয়ে দিয়েছে মানুষের জীবন জীবিকা। বাঁচার তাগিদে ফের নতুন জীবন সংগ্রামে আগামীর রসদ খুঁজতে শুরু করেছেন মানুষ। জীবন আর নদী যেন আগের মতই এক হয়ে বইতে চাইছে। শান্ত প্রবাহে ধুইয়ে দিতে চাইছে পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে যাওয়া পলি। নৌপথে পর্যটকরা হয়তো কদিন বাদেই ভীড় জমাবেন অমরপুরের গর্ব ছবিমুড়ায়। যা ইতিমধ্যেই রাজ্যের গন্ডী ছাড়িয়ে দেশের পর্যটন মানচিত্রে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

শহর অমরপুর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে ছবিমুড়ার অবস্থান। দেববাড়ী ভিলেজের রাধুর খামারের পাশ দিয়ে কলকল শব্দে বয়ে যাওয়া গোমতী নদীর গায়ে খোদিত বিভিন্ন দেবী চাকরাকমার মূর্তিসহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে। স্থানীয় জনজাতিরা চাকরাকমারকে দেবী রূপে পূজো করেন। কেউ কেউ আবার এঁকে দেবী রুদ্র ভৈরবী কেউবা দেবীদুর্গার মূর্তি রূপে মান্য করেন। দেবীমূর্তি নিয়ে নানা জনের নানা মত থাকলেও ছবিমুড়ার পাদদেশ রাধুর খামার তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি ২০১১ সাল থেকেই ওই স্পট পিকনিক প্রেমী ও ভ্রমণ পিপাসু দেশী-বিদেশী পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষনীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। পৌষ সংক্রান্তির পূণ্য লগ্নে ছবিমুড়ায় ঐতিহাসিক দেবী চাকরাকমার মন্তান্তরে দেবী রুদ্র ভৈরবী কিংবা দেবী দুর্গার মূর্তিকে কেন্দ্র করে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে।

ছবিমুড়া ও তার সন্নিহিত অঞ্চল ঘিরে বহু গল্পগাথা ও মিথ চালু রয়েছে। যে ভিলেজে ছবিমুড়া অবস্থিত সেই দেববাড়ী নামকরণটাও ছবিমুড়ার গোমতী নদী গাত্রে খোদিত দেবদেবীর মূর্তির অনুকরণে করা বলে স্থানীয় প্রবীন বাসিন্দাদের অভিমত। গোমতীর দুই পাড়ে অসংখ্য গাছপালা ঝোপঝাড়, বাঁশবন, পাখীর কোলাহল, ভ্রমণ বিলাশি পর্যটকদের আবেগ মহিত করে তোলে। ঠিক যে স্থান জুরে গোমতী নদী গাত্রে খোদাই করা দেবদেবীর মূর্তিগুলি শুরু হয়েছে গোমতীর সেই স্থানে পৌঁছলে মনে হবে নদীর জল যেন প্রবাহিত হচ্ছে না, নৌকা যেন এগুচ্ছেনা। ওই স্থানে গোমতী নদীর জল ধীরস্থির। নদী পথে আর কিছুটা এগুলেই দেখা মিলবে গোমতীর জলের উপর অসংখ্য বুদ বুদ উঠছে আবার নদীর জলেই মিশে যাচ্ছে। নদীর বুদ বুদ স্থান পেরিয়ে আর কিছুটা সামনের দিকে এগুলেই দেখা মিলবে ঘূর্ণিপাকের। গোমতীর নদীর জল আপনা আপনি ঘুরপাক খাচ্ছে, যেন ওই ঘূর্ণিপাকে পড়ে গেলে রক্ষে নেই। কিন্তু অদ্যাবধি ওই ঘূর্ণিপাকে কোন কিছু তলিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। গোমতীর ঘূর্ণিপাক অংশ পেরিয়ে সামনে এগুলেই সীতার কোর দেখা যাবে। সীতার কোর স্থানে গোমতীর গভীরতা আজো অজানা রয়ে গেছে। অমরপুরের জন্ম লগ্ন, তথা রাজন্য আমল থেকেই এখানকার বাসিন্দাদের বর্তমান উদয়পুর তথা তৎকালিন রাঙ্গামাটির সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল গোমতী নদীর জলপথ আর পায়ে হাঁটা পথ। নদীপথই অমরপুরের বাসিন্দাদের খাদ্যসামগ্রীসহ যাবতীয় সব কিছু পরিবহণের জন্য একমাত্র মাধ্যম ছিল।

ছবিমুড়ার পত্তন নিয়ে নানা গল্প ঁগাথা ও নানান রূপকথার প্রচলন রয়েছে। ছবিমুড়ার আসপাশের অঞ্চলে রয়েছে বহু ঐতিহাসিক পটভূমি এবং ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান। অমরপুরের দেববাড়ী, চাপিয়াবাড়ী ইত্যাদি অঞ্চলে বহু প্রাচীন লোক গাঁথার প্রচলনও রয়েছে। আবার এইসব প্রাচীন লোক গাথার স্বপক্ষে রয়েছে বাস্তব নিদর্শন। ছবিমুড়া যে স্থানে অবস্থিত তার উল্টো দিকের উপরের উঁচু পাহাড়ে রয়েছে পুরানো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বিশাল উঁচু ওই পাহাড়ের উপরেই রয়েছে একটি পুকুর তথা জলাশয়। পুকুরে রয়েছে বরফ শীতল জল। রয়েছে একটি বয়স না জানা বিশালকায় বটবৃক্ষ। বট বৃক্ষের নিচে দাঁড়ালে শরীর মন জুড়িয়ে যায়। ওই বটবৃক্ষের পাশেই রয়েছে 'মতাই লকু' যার

. বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় দেবতাদের আক্রা। যদিও জনজাতিদের চৌধুরীরা ওই স্থানটিকে দেবাদিদেব মহাদেবের আক্রার সাথে তুলনা করে থাকেন। নিজের জটায় গঙ্গাকে ধারণ করা অবস্থায় শিবলিঙ্গের আকৃতি সাদৃশ্য একটি পাথরের পাটাতন সহকারে মাটিতে পোতা রয়েছে। পাটাতনের মাঝে শিবলিঙ্গের আকৃতির মাটিতে পোতা পাথর খণ্ডটি যথারীতি বিদ্যমান।

মতাই লুকু এবং বিশালকায় বটবৃক্ষকে ঘিরে নানান রূপকথা ও গল্পগাঁথা রয়েছে সাধারণ্যে। একটি মাত্র পায়ে হাঁটা পথ ছিল মহারাণী-চাপিয়াবাড়ী হয়ে অমরপুরের রাঙ্গামাটি গ্রামের মধ্যে। ওই পথেই রাজা ও জমিদাররা ঘোড়া কিংবা হাতির পিঠে যাতায়াত করতেন বলেও তথ্য রয়েছে। মহারাণী চাপিয়াবাড়ী হয়ে রাঙ্গামাটি হাঁটা পথের পথিকরা ওই বট বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম করতেন। আর মতাই লকুর পাটাতনে চাপদিয়ে শিবলিঙ্গ সাদৃশ্য প্রস্তরখণ্ডের গোরা থেকে বের হওয়া জলেই ক্লান্ত পথযাত্রীরা তৃপ্তির সাথে তৃষ্ণা মেটাতেন। বছর ত্রিশেক পূর্বেও ওই মতাই লকু থেকে জল বের হওয়ার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার সুভাগ্য কলমচির হয়েছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে ক্ষয়ে যাওয়া পাথর ও বটবৃক্ষটি যথাস্থানে বিরাজমান থাকলেও সেই মতাই লকু থেকে জল বের হয় কিনা জানা যায়নি। চাপিয়াবাড়ীর ওই প্রাচীন বটবৃক্ষের জন্ম নিয়েও রূপকথা রয়েছে। গোমতী নদীর অববাহিকা অঞ্চলে তথা ছবিমুড়ার পাদদেশে চাপিয়াবাড়ী, দেববাড়ী ভিলেজের অবস্থান। চাপিয়াবাড়ীতেই সিরিজয় রিয়াং ও ইরিজয় রিয়াং নামে দুই যমজ ভাই ছিলেন। জোড় ভাই হিসাবেই ওরা সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। ওই দুই যমজ সহোদরের মধ্যে একজন তথা সিরিজয় রিয়াংয়ের শৈশবেই সর্পাঘাতে অকাল মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর সিরিজয়ের মৃতদেহ চাপিয়াবাড়ীর উঁচু

পাহাড়ের উপরে বর্তমানে যে স্থানে বিশালকায় বটবৃক্ষটি রয়েছে সেই স্থানে মাটি চাপা দিয়ে সমাধিস্থ করে সেস্থানে বটবৃক্ষের চারা রোপন করা হয়। সেই বটবৃক্ষের চারাটিই বর্তমানে বিশালকায় প্রাচীন বটগাছ। সিরিজয়ের সহোদর ইরিজয় রিয়াং-এর বৃদ্ধাবস্তায় চাপিয়াবাড়ীতেই মৃত্যু হয় বলে স্থানীয়দের থেকে জানা যায়। চাপিয়াবাড়ী যে টিলা বা পাহাড়ের উপর অবস্থিত সেই পাহাড়েরও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের ঢালে জুমচাষ করার পর্যাপ্ত টিলা ভূমি থাকলেও ওইসব এলাকার জুমিয়ারা ওই পাহাড়ের ঢালে জুম চাষ করতে সাহস পান না বলে তাঁরা নিজেরাই জানিয়েছেন। স্থানীয়দের মধ্যে রটনা রয়েছে মতাই লকু'র অবস্থানরত ওই পাহাড়ের ডালে যে বা যারাই জুমচাষ করেছে তাদের পরিবারের কারোর না কারোর হয় রোগশোকে নয় সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত। তবে এটাও ঘটনা ওইসব পাহাড় ও টিলাভূমিগুলিতে বিভিন্ন প্রজাতির বিষধর সাপের আনাগোনা রয়েছে। এত বিশাল আকারের সাপ রয়েছে যে চোখে দেখেই মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়। বছর কয়েক আগে চাপিয়াবাড়ীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তথা উদয়পুর মহকুমার কলশি ভিলেজে উনিশ কেজি ওজনের বিশালকায় সাপ শিকার করে মাংস হিসাবে কেজি দরে বিক্রি করে। তবে বিশালকায় সাপটির মাথাটি সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসি সংরক্ষণ করে রেখেছেন বলে ভিলেজে চাউর আছে।

দেববাড়ী ও চাপিয়াবাড়ীর মাঝে প্রায় দেড়শত মিটার উঁচু পাহাড়ের উপর একটি ভগ্ন মন্দিরের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। জানা যায় প্রাচীনকালে ওই মন্দিরে কালীমূর্তি ছিল। ৫০-৬০ এর দশকে ওই মন্দিরে উদয়পুর মহকুমার কলসীবাড়ীর মলসুম সম্প্রদায়ের জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পূজাপাঠ চলতো। চাপিয়াবাড়ীর ওইপাহাড় থেকে পশ্চিম দিকে নীচে নামলেই চামচামা ছড়া। এই ছড়াটি সরাসরি গোমতী নদীতে গিয়ে মিশেছে।

৭০-এর দশকে অমরপুর ও তার আসপাশ এলাকার যুবা ও কিশোরদের কাছে ছবিমুড়া অনেকটা রোমাঞ্চকর অভিযানের ও পিকনিকের স্থান হিসাবে পরিচিতি পেয়ে যায়। দলে দলে দামাল কিশোর ও যুবরা নৌকায় চেপে ছবিমুড়া পৌঁছে যেত। পাহাড় বেয়ে উঠে যেতো শতবর্ষ প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে। সকালে রাঙ্গামাটি ঘাট থেকে নৌকায় চেপে রওনা হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই নদীর ভাটার টানে ছবিমুড়ায় পৌঁছে যাওয়া যেত। কিন্তু ফেরার সময় উজানে নৌকা বেয়ে অমরপুর পৌঁছাতে অনেকটা সময় লেগে যেত। বর্তমান রাধুর খামার থেকে ছবিমুড়ার দেবী চাকরাকমার মূর্তির পদতলে পৌঁছানোর খানিকটা আগে গোমতীর পূর্ব পাড়ে রয়েছে একটি প্রাচীন গুহা। ওই গুহা নিয়েও গল্প গাঁথা রয়েছে। ছবিমুড়ার অন্যতম আকর্ষণ রহস্যে ঘেরা ওই গুহা। নদী থেকে সরাসরি গুহায় প্রবেশ করা যায় না। নদীর জল পার থেকে মই বেয়ে গুহার মুখে পৌঁছতে হয়। আগেরকার দিনে পাহাড়ের সিড়ি বেয়ে গুহার মুখে পৌঁছানো যেত। কারণ গোমতী তখন জলে পরিপূর্ণ ছিল। গা ছম ছম করা রহস্যে ঘেরা গুহার ভেতরে কি আছে তা আজও সকলের অজানা। অদ্যাবধি ওই গুহার ভেতরের রহস্য ভেদ কেহই করতে পারেনি। কেউ কেউ গুহার ভেতরের অনেকটা দূর পর্যন্ত যেতে সমর্থ হলেও ক্রমশ ভেতরের দিকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকার কারণে সকলকেই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হয়েছে। মেঘলা দিনে গুহাটির ভিতরে কিছুদূর এগুলেই পাহাড় চুয়ানো জলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে চুয়ানোর জল পরার শব্দও শুনা যায়। গুহার ভেতরে আজব আজব শব্দে শরীরে অজানা অনুভূতির জন্ম নেয়। ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগে। অনেকে ওই ঝাঁঝালো গন্ধকে কেরসিন তেলের গন্ধের সাথে মিল রয়েছে বলে মনে করে ওইরকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া গুহার ভেতরে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য পাথরখণ্ড। কথিত আছে একসময় দেবতামুড়া অঞ্চলে চিচিংফা নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা চিচিংফার অতি সুন্দরী রাজকন্যা ছিল। পাহাড়, জঙ্গল, জঙ্গলের গাছপালা, পশুপাখিদের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হতে থাকে রাজকন্যা হীরাবতী। একসময় শ্বেতহস্তি নামের এক হাতির নজর পরে রাজকন্যার উপর। রাজার অগোচরে শ্বেতহস্তি রাজকন্যাকে অপহরণ করে গোমতী নদীর উৎসস্থল কালাঝারী পাহাড়ের ভগীরথ পাড়ার গভীর অরণ্যে পালিয়ে যায়। রাজা রাজকন্যাকে উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে ঘোষণা করেন রাজকন্যাকে উদ্ধার করে যে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে দিতে পারবে তার সাথেই রাজকন্যা হীরাবতীকে বিয়ে দেওয়া হবে সাথে অর্ধেক রাজত্বও দেওয়া হবে। রাঙ্গিয়া ও ফতে নামে দুই ভাই রাজকন্যাকে উদ্ধারে নামে। রাঙ্গিয়া ছিল খুবই চালাক চতুর এবং বুদ্ধিমান। আর ফতে ছিল বোকা হাঁদা তবে অসম্ভব বলশালী। খুঁজতে বেড়িয়ে দুই ভাই শ্বেতহস্তি ও রাজকন্যার সন্ধান পেয়ে যায়। গোমতীর উৎসস্থলে শ্বেতহস্তির সাথে দুই ভাইয়ের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শ্বেতহস্তিকে বধ করে দুই ভাই রাজকন্যাকে উদ্ধার করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। (পাঠকরা যদি কখনো তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে থাকলে লক্ষ্য করবেন যুদ্ধরত যুবকসহ একটি সাদা হাতির মূর্তি মেলা প্রাঙ্গণের পাশেই গোমুখের পাশে স্থাপিত আছে। যা ওই গল্প গাঁথার উপর অগাধ বিশ্বাসের ফল সরূপ জনজাতিদের একটি সম্প্রদায়ের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে।) এদিকে দুই ভাইয়ের মধ্যে কে শ্বেতহস্তিকে বধ করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেছে এনিয়ে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। তবে শেষে রাজা চিচিংফা ফতের সাথেই রাজকন্যার বিয়ে দেন। যদিও এনিয়ে মতান্তর রয়েছে। এও কথিত রয়েছে রাজা চিচিংফা তার সমস্ত ধন সম্পত্তি ওই গুহার ভেতরে লুকিয়ে রেখে গেছেন। গুহার ভেতরে ধনসম্পত্তির নিকট কিভাবে পৌঁছাতে হবে তা গুহার ভেতরেই সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা আছে বলেও রাজা দুই ভাইকে জানিয়ে যান এবং সূর্য অস্তাচলে যাবার পূর্বেই ওই গুহা থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে বলেও রাজা দুই ভাইকে সতর্ক করে যান। নতুবা দেবী চাকরাকমার রোষাণলে গুহার ভেতরেই প্রাণ বিষর্জন দিতে হবে বলেও কথিত আছে। আবার এটাও প্রচলিত রয়েছে রাজা চিচিংফা তার সমস্ত ধন সম্পত্তি বিশাল কাঠের তৈরী সিন্ধুকে ভরে ওই গুহার ভেতরে রেখে গেছেন। যার প্রহরায় নিযুক্ত আছে বিশালাকায় অজগর সাপ। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে গুহাটি আজো অক্ষত অবস্থায় তার নিজস্বতা বজায় রেখেছে। যদিও ওই গুহার ভেতর বিভিন্ন প্রজাতির বিশালকায় বিষধর সাপ রয়েছে বলে আজো অনেকেই বিশ্বাস করেন। অনেকেই ওই গুহার ভিতরে প্রবেশ করেছেন কিন্তু গুহাটির রহস্য

. ভেদ করা দূর অন্ত গুহার ভেতরে বেশি দূর পর্যন্ত এগোতেই পারেননি। একে ঘুটঘুটে অন্ধকার তার উপর ঝাঝালো গন্ধ আর বিচিত্র সব গা ছমছম করা শব্দে অতি সাহসিরাও ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

নদীপথে রহস্য ঘেরা গুহা পেড়িয়ে কিছুটা এগুলেই গোমতীর পশ্চিম দিকের গায়ে দেবদেবীর মূর্তি খচিত নীরব নিস্তব্ধ স্থান ছবিমুড়া। গোমতীর পূর্ব পাড়ের সেই গুহা ও পশ্চিম পাড়ের নদী গাত্রে দেবদেবীর মূর্তি খোদিত স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে গোমতীর পূর্ব পাড়ের উঁচু দুটি পাহাড়ের উপর থেকে ঝর্ণার জল থেকে নেমে এসেছে একটি ছড়া। গোমতীর পূর্ব পাড়ের দুটি পাহাড়ের একটি থেকে নেমে আসাছে ঠাণ্ডা জল আর অপরটি থেকে নেমে আসছে গরম জল। পাহাড় দুটির জল নিচে নেমে একত্র হয়ে ছড়ার আকার ধারণ করে গোমতীতে মিশেছে। উঁচু পাহাড়ের যে স্থান থেকে ঝর্ণা দুটি সৃষ্টি সেই স্থানের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হবে ওখানে কোন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ভুল ভাঙ্গতে কিছুটা সময় লাগবে। আদতে ঝর্ণার জল গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের গায়ে মানুষের আকৃতি অবয়ব তৈরি হয়েছে। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসা ঝর্ণা দুটি যেখানে মিলিত হয়েছে সেই স্থানটির নাম তুইসা মতাই বাংলাভাষায় যা মূর্তি ছড়া বা ভগবান ছড়া।

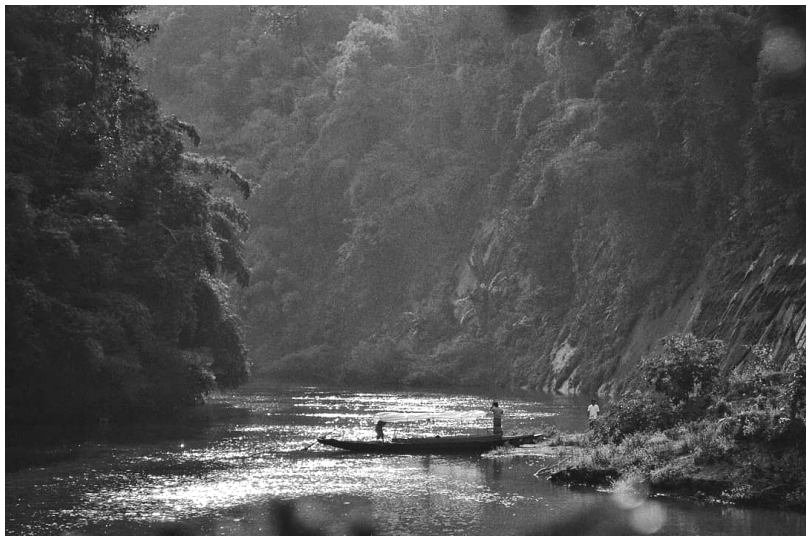

জঙ্গী সন্ত্রাসের ফলে ৮০'র দশকের শুরু থেকেই ছবিমুড়াতে স্থানীয়দের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যায়। ৯০'র দশকে ছবিমুড়া. জঙ্গীদের মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়। জঙ্গী সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আসার পর ২০০১-২০০২ থেকে পুনরায় রাজ্যের অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের আনাগোনা শুরু হয়। তৎকালীন অমরপুর ব্লকের বি.ডি.ও প্রসূন দে, তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তথা অমরপুরের সন্তান সুভাষ দাস এবং অবিভক্ত দক্ষিণ জেলার জেলাশাসকের আন্তরিক উদ্যোগে পুরানো ঐতিহ্য ফিরে পায় ছবিমুড়া। পরবর্তী সময়ে এস ডি এম সজল বিশ্বাসের প্রয়াসে ছবিমুড়া পর্যটনের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপে আসতে শুরু করে। তাঁর উদ্যোগেই রাধুর খামারে সার্বিক উন্নয়ন যজ্ঞ শুরু হয়েছিল।

টেরাকাটা শিল্পের শৈল্পিক মাধুর্যে শিল্পীর অনবদ্য সৃষ্টি তথা নদী গাত্রে খোদিত দেবদেবীর মূর্তি গুলি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এজাতীয় পুরাকীর্তি সংরক্ষণের তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। অথচ পর্যটন নিগম কোটি টাকা খরচ করছে বিজ্ঞাপনের নামে? যে শিল্প ভাস্কর্যের টানে দেশ বিদেশের পর্যটক ছবিমুড়ায় ছুটে আসেন সেই নিদর্শনগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেই কেন? প্রশ্ন করছেন এখানে ঘুরতে আসা দেশী-বিদেশী পর্যটকরা। শিল্প সুসমা মণ্ডিত গর্বের ছবিমুড়া পুনরায় নতুন রূপে সেজে উঠবে সেই আশায় দিনগুনছেন অমরপুরবাসী।

"দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়
আমার অন্তরে বার বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূবের অবরুদ্ধ সিংহ দুয়ার !

ধ্রুবরঞ্জন সেন। আগরতলা।

"এসো এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে ..."

মানবতাবাদের কবি রবি ঠাকুরের এই অমোঘ আহ্বান আজ কান পাতলেই শোনা যায় দক্ষিণের প্রান্তিক শহর সাব্রুমে। অফুরাণ সম্পদের পরও কোনো এক অদৃশ্য কারণে উন্নয়ণের পরিবর্তে অহল্যাভূমি তকমা লেগেছিল সাব্রুমের গায়ে। কিন্তু সাব্রুমবাসীর হার না মানা জেদে পিছিয়ে পড়া এই প্রান্তিক শহর আজ গর্বের সঙ্গে মাথা তুলেছে। খুলে যাচ্ছে পূবের অবরুদ্ধ দুয়ার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে ওঠার প্রহর গুনছে সাব্রুম।

এক সময় অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার এই মহাকুমা শহরের নাম শুনলেই মানুষ আঁতকে উঠতেন। দিনের পাঠ চুকিয়ে দীপঅংশুমালী পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার আগেই শুরু হয়ে যেতো শেয়ালের ডাক। চাকরিজীবীদের কাছে এঅঞ্চল ছিলো শাস্তিযোগ্য বদলির স্থান? সামান্য বৃষ্টিতেই যোগাযোগ ব্যবস্থা থমকে যেতো। মনু নদীর জল বেড়ে গেলে জুরিন্দা দিয়ে গাড়ী পারাপার করা ছিলো প্রচুন্ড ঝুঁকির। ১৯৭৮ সালে নৃপেন চক্রবর্ত্তী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই ঘোষণা দিয়েছিলেন মনুনদীর বুকে গড়ে উঠবে স্থায়ী ব্রীজ। যা বলছিলাম, সামান্য বৃষ্টি হলেই এক লাফে বেড়ে যেতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। ছয়ের দশকে সাব্রুমে দেড় কেজি চালের দাম ছিলো মাত্র এক টাকা। বেগুন প্রতি কেজি তিন পয়সা। আর দুই কেজি কিনলে পাঁচ পয়সা। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালের দাম বেড়ে হতো এক টাকায় নয়শো গ্রাম! আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেরা সাব্রুমের পাশেই বয়ে যাওয়া ফেণী ভাগ করে দিয়েছে দুটি দেশকে। ঐতিহাসিক কারণে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে দুটি দেশের জন্ম। ১৯৭১ এর মুক্তি যুদ্ধে হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেলো গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশে। দেশ ভাগ হলেও একই ভাষা, সংস্কৃতি মানুষের প্রাণের আবেগকে কেউ আজ পর্যন্ত ভাগ করতে পারেনি। ওপাড়ে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অন্যতম বাণিজ্যিক শহর রামগড়। এপাড়ে দেবী দৈত্যেশ্বরী কালিবাড়ী খ্যাত সাব্রুম। জাতি-উপজাতি মানুষের অটুট মেলবন্ধন আশির ভ্রাতৃঘাতী দাঙার সময়েও কেউ ভাঙতে পারেনি। সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দুটি স্বাধীন দেশকে আলাদা করলেও প্রাণের আকুতি আজও বহমান।

ফেনী নদীর ওপাড়ে রামগড় শহরকে নিয়েও রয়েছে না বলা অনেক ইতিহাস। সেখানেও নাকি ছিলো বিশাল দুর্গ। এখনকার মতো আগে আন্তর্জাতিক সীমান্তে তেমন কড়াকড়ি ছিলোনা। ফলে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে মানুষ এপারে চলে আসতেন অবাধে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করে দিনের শেষে আবার ফিরে যেতেন। ইতিহাসে প্রমাণ্য দলিল রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জনজাতির অংশের মানুষের বাসস্থান গড়ে উঠেছিলো প্রাচীন কাল থেকেই। রাজমালাতেও তার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রিপুরী, চাকমা এবং মগরাই ছিলো প্রধান। কিছু কিছু অংশে রিয়াং জনগোষ্ঠীর মানুষও বসবাস করতেন। হাতে পাওয়া তথ্য বলছে দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রান্তিক শহর সাব্রুম ও তার আশেপাশে ত্রিপুরী, চাকমা, মগ এবং অল্প সংখ্যক রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে। এখানে বসবাসকারী বাঙালীদের বিরাট অংশ এসেছেন বাংলাদেশের নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম থেকে। কৃষি প্রধান এই মহকুমা কিন্তু শিক্ষার দিক থেকেও পিছিয়ে ছিলোনা এবং বর্তমানেও নেই। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে কবে এই মহকুমা শহরের পথ চলা শুরু। সাব্রুম নামাকরণের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে রাজ্যের বিশিষ্ট গবেষক এবং সাংবাদিক অশোকানন্দ রায় বর্ধনের প্রায় তিন দশক আগের একটি লেখা আমার নজরে আসে। ভারত সংঘের (পুরানো অফিসটিলা) ১৪০১ এবং ১৪০২ বঙ্গাব্দের পর পর প্রকাশিত দুটি পূজা সংখ্যায় অনেক গ্রহণযোগ্য তথ্য তিনি পরিবেশন করেছিলেন। উপযুক্ত সংরক্ষনের অভাবে এগুলো এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে বসবাসকারী জনজাতি অংশের বিরাট অংশ হলো ত্রিপুরী। তাদের মাতৃভাষা ককবরক। এই ভাষায় একটি শব্দ হলো "চা" অর্থাৎ খাওয়া! এরকম আরেকটি শব্দ "ব্রুম ব্রুম"। এর অর্থ বার বার। শব্দগুলোকে পরপর যোগ করলে হয় "চা + অ + ব্রুম + ব্রুম" -- অর্থাৎ বার বার খেতে আসা। সম্ভবত এই চাব্রুম রূপান্তরিত হয়ে সাব্রুম শব্দটি এসেছে! এথেকে বোঝা যায় বহুকাল আগেই এখানে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেতো। যা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। এই খাবার আরোহণের লোভেই বহিরাগতরা

বারবার আসতেন। দোঁআশ মাটি উর্বর গোবিন্দ মাঠে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয় তাহলে সারা বছর এই গোবিন্দ মাঠ সাব্রুবাসীকে খাদ্য সরবরাহ করতে সক্ষম। পাশাপাশি টিলাভূমিতেও সেসময় বিভিন্ন রকমের ফল গাছ ছিলো। যেকারণে যুগ যুগ ধরে খাবার সংগ্রহের জন্য বহিরাগতরা এখানে ছুটে এসেছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। এখানকার প্রবীন বাসিন্দা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াত কালিপদ ব্যানার্জীও বলেছিলেন এই জনপদে বার বার সুলভে খাদ্য সংগ্রহের জন্য বিজয়ীরা আসতো বিজিতদের কাছে। এথেকে বোঝা যায় এই অঞ্চল বারবার বহিঃ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে সাব্রুমের নাম নিয়ে রাজ্যের প্রখ্যাত ভাষা গবেষক ও প্রাবন্ধিক প্রয়াত ডঃ অনাদি চরণ ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধ সংকলন "ত্রিপুরা ও ত্রিপুরী" গ্রন্থে লিখেছিলেন সাব্রুম শব্দটি নাকি এসেছে "ছাগ" ব্রুম ব্রুম থেকে। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনি যুক্তিও উপস্থাপন করে গেছেন। গবেষক অশোকানন্দ রায় বর্ধনের লেখা থেকে জানা যায়, তাঁর সঙ্গে সাব্রুমের ভূমিপুত্র কালিকুমার ত্রিপুরার মত বিনিময় হয়েছিলো। তিনি জানিয়েছিলেন তাদের ফাতুইঙ্গা গোষ্ঠীর মানুষেরা "ব্রুম" বলতে বোঝাতেন "সেনানিবাস বা কেল্লা"। প্রাচীন রাজমালায় কথিত আছে, সাব্রুমে গড়ে উঠেছিল রাজার সৈন্য বাহিনীর বিরাট কেল্লা। কালের বিপর্যয়ে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এই কেল্লা থেকেই সাব্রুম নামের সৃষ্টি বলে গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। আমরা যখন সাব্রুম মডেল স্কুলে পড়তাম তখন হরিচৌমুহনী বা বর্তমান হাসপাতাল চৌমুহনির পাশে প্রচুর মূল্যবান ইটের ধ্বংস্তুপ দেখেছি। ধারণা করা হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দোর্দন্ড প্রতাপশালী শমসের গাজী সাব্রুম আক্রমণ করে রাজার সেনাবাহিনীর কেল্লা ধ্বংস করেছিলেন। আজও শমসের গাজীর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে আমলীঘাটে।

রিয়াং জনজাতি অংশের মানুষ নিজেদের "ব্রু" বলে পরিচয় দেন। তাদের লোককাহিনীতে রয়েছে রামগড়ের পাশে রামচিরাতেই ছিলো তাদের পূর্ব বাসস্থান। পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত হয়ে তারা দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েন। সাব্রুমেও তাদের বসবাস ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। রিয়াংদের ভাষা "কাউব্রু" অনুযায়ী "সাব্রুঁ অর্থাৎ একঘর রিয়াং জাতির বসবাস! এই সা --ব্রুঁ থেকেই সাব্রুম নামের উৎপত্তি বলে রিয়াংরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। এঅঞ্চলে বসবাসকারী অন্য একটি বিশিষ্ট জনজাতি গোষ্ঠী হল মগ। প্রাচীন ইতিহাস অনুযায়ী মগরা এসেছেন আরাকান থেকে। এরা নিজেদের ভাষায় চাকমাদের বলেন "সাক" আর গ্রাম অর্থে ব্যবহার করেন "রুঁ" শব্দটি। এর থেকে সৃষ্ট সাক + রুঁ = সাকরু যার অর্থ এটি চাকমাদের গ্রাম। বিশিষ্ট শিক্ষক তথা প্রখ্যাত ফুটবলার তিমির চাকমার প্রয়াত দাদু ছোটবেলায় আমাদের কাছে এই তথ্য গল্পের আকারে পরিবেশন করেছিলেন। আমরা তখন ওঁনাদের আমতলী বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। গোটা সাব্রুমে একসময় চাকমাদের জনবসতিগড়ে উঠেছিলো। আজও মহকুমার শিলাছড়িতে চাকমা জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। "সাক-রুঁ শব্দটি কালের বিবর্তনে সাব্রুম হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। অন্যদিকে মগ ভাষা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ও গবেষক জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষিকা ক্রৈরী মগ চৌধুরীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী "সাব্রুম" শব্দটি মগ ভাষায় "চ্ছুই স্রাও" অর্থাৎ রক্তের নদীই হলো সাব্রুম শব্দের উৎস। এক সময় বহি:শক্তির সঙ্গে ফেণী নদীর পাড়ে ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে বহু সেনা আহত এবং প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাদের রক্তে ফেণী নদীর জল লাল হয়ে গিয়েছিলো! কালের বিবর্তনে এই "চ্ছুই স্রাও" থেকে সাব্রুম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে তাঁর দাবী। এইসব তথ্য ও যুক্তি বিশ্লেষন করে সাব্রুম শব্দের মূল উৎস নির্ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ!

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার মানচিত্রে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমের পাশেই ফেনী নদীর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সাব্রুম জনপদের কোনো উল্লেখ ছিলোনা। আবার সমসের গাজীর কাহিনী সম্বলিত গাজীনামাতেও ফেণী নদীর কথা বলা হয়েছে। প্রচীন তথ্য অনুসারে এই প্রান্তিক শহরের বয়স কিন্তু খুব একটা বেশী নয়। বিভিন্ন দলিল, প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রলিপি থেকেও এব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। তবে একসময় আমলীঘাট আর্থিকভাবে বেশ মজবুত এবং জমজমাট ছিলো। এক্ষেত্রে সমসের গাজীর ভূমিকা কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। যদিও সাব্রুমে মা দৈত্যেশ্বরী কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো কম করেও প্রায় দেড়শো বছর আগে। প্রচলিত লোক কাহিনী মোতাবেক সাব্রুমের প্রাচীন বাসিন্দা প্রয়াত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মাগরুম থেকে মা দৈত্যেশ্বরীকে এনে বর্তমান মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্যদিকে রাজমালা অনুসারে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করে সাব্রম বিভাগের পত্তন করেছিলেন। বাস্তবে কিন্তু তার অনেক আগেই খাদ্য সম্পদে পরিপূর্ণ ফেনী নদীর কূলে এই জনপদ গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা অর্জনের অনেক আগেই অবিভক্ত ভারতের পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী বা পূর্ব চাকলা রোশনাবাদ থেকে বাঙালীদের

ঢল নামে সাব্রুমে। এদের অনেকেরই ফেলে আসা স্থানে ছিলো প্রচুর জায়গা জমি। ওই সময় গোটা সাব্রুম জুড়ে গঠনের কাজ চলছিলো এবং এখনো অব্যাহত। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড়, বাগানবাজার প্রভৃতি এলাকা আর্থিকভাবে দারুন মজবুত ছিলো। সাব্রুমে বসবাসকারী অনেকেরই দোকানপাট, বাড়িঘর এবং কৃষি জমি ছিলো রামগড়ে। যদিও সবকিছু ছেড়ে তারা সাব্রুমে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখন সাব্রুম হতে চলছে 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সিংহ দুয়ার''। ফেনী নদীর বুকে গড়ে উঠেছে মৈত্রী সেতু। চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করে শুরু হবে আমদানী রপ্তানি বাণিজ্য। সংযোগ হবে রেল পথের। রাজ্যের তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী, বর্তমান বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে সাব্রুমে সাংবাদিকদের বৈঠকে ঠিক হয়েছিলো ভারত বাংলাদেশকে যুক্ত করতে প্রস্তাবিত সংযোগরক্ষাকারী সেতুর নাম হবে "মৈত্রী সেতু''। ইতিমধ্যে কর্ণফুলী ও ফেনী নদী দিয়ে গ্যালন গ্যালন জল প্রবাহিত হয়েছে। দু'দেশের মানুষের স্বপ্ন সফল হওয়ার মুখেই রক্তক্ষয়ী ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে গভীর ষড়যন্ত্র করে মুজিব কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করানো হয়। প্রাণরক্ষায় তাঁকে ভারতে চলে আসতে হয় সোনার বাংলা ছেড়ে। এক অরাজক অবস্থা চলছে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দু'দেশের অর্থনীতি, মৈত্রী, কৃষ্টি, সংস্কৃতি। ফলে কবে নাগাদ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য পরিবাহী গাড়ি অতিক্রম করবে মৈত্রী সেতু, আখাউড়া -আগরতলা ট্রেন যোগাযোগ শুরু হবে সে নিয়ে বিরাট প্রশ্ন তৈরী হলো। এককথায় ষড়যন্ত্রীদের চক্রান্তে অবরুদ্ধ হয়ে রইল পূবের সিংহদুয়ার, সাব্রুম?

মৈত্রী সেতু, সাব্রুম।

জল পুরাণ

তাপস দেবনাথ। আগরতলা।

জলের নাম জীবন। এই জলই আবার কখনও কখনও প্রাণঘাতীও হয়। মূলত বন্যা, মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি, সুনামির মতো জলোচ্ছ্বাস বা ঝড়ের সময়ে। সমুদ্রের মাঝখানে নৌকা জাহাজে দাঁড়িয়ে চোখের সীমানা পেরিয়েও শুধু জল আর জল। কিন্তু একটুও খাওয়া যায় না। পানীয় জলের জন্য জীবন চলে যায়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অলৌকিক জলযান' গ্রন্থে পানীয় জলের অভাবে নায়ক কিভাবে বেঁচে ছিলেন পাঠক জানেন। পড়তে পড়তে শিহরিত হতে হয়। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী' উপন্যাসে জলের অভাবের কাহিনি আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। এবারকার ত্রিপুরার বন্যায়ও চারদিকে এত জল, অথচ মানুষ পানীয় জল পাচ্ছিলেন না। এক বোতল পানীয় জল মহার্ঘ হয়ে ওঠে। কিন্তু আবহমানকাল থেকেই এই জল নিয়ে চলছে রাজনীতি। মানব সভ্যতার শুরুতে যখন সাম্রাজ্য দখলের চেষ্টা শুরু হয় তখন জলপথই ছিল ভরসা। আর তখন থেকেই সমুদ্র, নদীতে জলপথ দখলের লড়াই চলছে। আজও সেই লড়াই অব্যাহত। জল নিয়ে আবার অন্যরকম লড়াই। বাঁধ দিলেও সমস্যা, না দিলেও সমস্যা। শুখা মরশুমে কেউ দাবি করছে নদীর জল বন্টনের। কেউ অভিযোগ করছে বর্ষায় ড্যাম এর জল ছাড়ার ফলে বন্যা হয়েছে। এ নিয়ে চলছে বিদ্রোহ, এমনকি যুদ্ধ। দেশে দেশে এমনকি একটি দেশের রাজ্যে রাজ্যে। বারবার বৈঠক করেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বিজ্ঞানীদের অভিমত, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি কখনও হয়, তা হবে পানীয় জল নিয়ে।

ত্রিপুরা এবছর (২০২৪ সাল) ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয়েছে। ১৯ থেকে ২২ আগস্টের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেকে এর সঙ্গে ১৯৮৩ সালের বন্যার তুলনা করেন। অনেকে মনে করছেন, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং ৩৮ জন মানুষের মৃত্যুর নিরিখে এই বন্যা অনেক বেশি প্রলয়ঙ্করী। সরকারই জানিয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। বেসরকারি মতে ২৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই বন্যা দেখে আমার দাদুর কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন ১৯৫৬ সালের বন্যা ছিল ভয়ঙ্কর। হাওড়া নদীর বাঁধ ভেঙ্গে ঘরের সিলিং অবধি নাকি জল উঠেছিল আগরতলায়। মানুষকে হাতিতে করে কুঞ্জবন, বড়দোয়ালি, কলেজটিলা ইত্যাদি উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আমার তখন জন্ম হয়নি। যাদের বয়স ৮০ বছরের উপরে তারা বিষয়টি মোটামুটি বলতে পারবেন।

'ত্রিপুরার গণ-আন্দোলন ও ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতি' গ্রন্থে দিলীপ দাম ১৯৫৬ সালে আগরতলার বন্যা নিয়ে লিখেছেন, 'খাদ্য সমস্যা নিয়ে রাজ্যের জনগণ যখন প্রচণ্ডভাবে জর্জরিত ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯৫৬ সনের ২রা জুন রাত্রে রাজধানী আগরতলা এক প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ভয়ঙ্করভাবে বিধ্বস্ত হয়। এই বন্যার প্রকোপ যদিও মাত্র তিনদিন স্থায়ী ছিল কিন্তু এর জের ছিল বহুদিন। সেই বিধ্বংসী বন্যায় আগরতলার জনসাধারণ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ঐ বন্যায় তিনজনের মৃত্যু ঘটেছিল। ত্রিপুরার ইতিহাসে ১৯৫৬ সালের বন্যা ছিল ভয়াবহ। সমগ্র আগরতলা শহর ছিল তিনদিন জলের নীচে। শহরের হাজার হাজার মানুষকে কলেজটিলাসহ বিভিন্ন নিরাপদস্থানে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সরকারকে বিভিন্নস্থানে খুলতে হয়েছিল রিলিফ ক্যাম্প।'

আগরতলা শহর অনেকটা কড়াই'র মতো। একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। যদিও সমতলভূমিতে অবস্থিত পৃথিবীর প্রায় সব শহরেই জলমগ্নতার ইতিহাস আছে। অন্তত যে সব শহর নদী, সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। লণ্ডন, কলকাতা, মুম্বাই সবারই এক দশা। আগরতলার চিত্র অবশ্য ভিন্ন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১২ ফুট উপরে অবস্থিত এই শহর। ফলে জল জমা বের করতে হয় পাম্প মেশিন দিয়ে। ১৯৫৬ সালের তুলনায় শহরের রাস্তাঘাট অনেক উঁচু হয়েছে। বাড়িঘরও। পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ করা ও জল নিকাশি নালাগুলির উপরে পাকা কভার করার ফলে জল ধারণ ক্ষমতা কমেছে। রাস্তাঘাট উঁচু হওয়ার পরেও শহরের সবচেয়ে নিচু জায়গা

শকুন্তলা রোড এবং গণরাজ চৌমুহনীসহ বনমালিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। ২০১৮ সালে বনমালিপুরে বন্যার জলে দাঁড়িয়ে এক মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের কাছে ঘোষণা করেছিলেন এক বছরের মধ্যে 'স্মার্টসিটি আগরতলা' শহরে আর জল জমবে না। এরপর থেকে প্রতিবছর বর্ষায় আগরতলা ভাসছে। শুধু বনমালিপুর নয়, এখন শহরের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। আগরতলা জলমগ্ন হলেই সংবাদমাধ্যম স্মার্টসিটিকে গালাগাল করছে। আগে কয়েক বছর পর পর জলে ভাসতো আগরতলা। এখন ফি বছর ভাসছে। আগরতলার ইতিহাস ও ভৌগোলিক জ্ঞান থাকলে তিনি এই ঢাক নিশ্চয়ই বাজাতেন না। সাধারণত এক ঘন্টায় ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হলে আগরতলা ভাসবেই। কেউ আটকাতে পারবে না। এজন্য আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব দিতে হয়। এখন দেখে নেওয়া যাক এর আগে আগরতলা কতবার ভেসেছিল।

বানভাসি আগরতলা। ভি.এম হাসপাতালের সামনে হাতির পিঠে বন্যার্ত মানুষ। ১৯৫৬ সাল।

আগরতলার বিপর্যয় ও বন্যার ইতিহাস বর্ণনা করে অধ্যাপক জগদীশ গণ চৌধুরী তার 'নতুন হাভেলি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'স্মরণীয় কালের মধ্যে ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৮২২, ১৮২৫, ১৮৭০, ১৯১৫, ১৯৩৪, ১৯৫৬ এবং ১৯৮৩ ভয়াবহ জলপ্লাবন হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের ১২ জুন প্রকাণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল। উপরের তথ্যগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম ত্রিপুরায় ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিকম্পের কথা। কিন্তু তিনি যা উল্লেখ করেননি তা হচ্ছে সেই ভূমিকম্পে ত্রিপুরার রাজবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে যায়। যে রাজবাড়ি মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৬২ সালে গৃহপ্রবেশের পরই তার মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় মহারাজ রাধাকিশোর ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ নির্মাণ করান। তবে অধ্যাপক গণ চৌধুরী জানিয়েছেন, 'ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৫৭৬, ১৭৭০, ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৮৬৬ এবং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে।' রিয়াং বিদ্রোহের নেতা রতনমণি রিয়াংকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৩ সালেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ত্রিপুরার রাজা ইংরেজদের পক্ষে অংশ নিয়ে সৈনিক ও খাবার পাঠিয়েছেন। এরফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হয়েছিল রিয়াং বিদ্রোহ। রাজা খাজনা আদায় করতে গিয়ে যাদের নিয়োগ করেন তাদের অত্যাচারে মানুষ ছিলেন অতীষ্ট। ফলে বিদ্রোহে কেঁপেছে ত্রিপুরা। এখানে প্রশ্ন আসতেই পারে ১৮৩৮ বর্তমান আগরতলার পত্তন করেছিলেন কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য। তাহলে ১৭৮৪-৮৫ সালে আগরতলায় বন্যা হয় কি করে? নতুন হাভেলি বা বর্তমান আগরতলা তৈরির আগে ১৭৬০-৬১ সালে পুরাতন আগরতলায় রাজধানী নির্মাণ করেন। যেখানে আজও চতুর্দশ দেবতা মন্দির রয়েছে। প্রায় ১০০ বছর পর ১৮৮০ - ৮২ সাল নাগাদ বর্তমান আগরতলায় রাজধানী পুরোপুরি নতুন হাভেলিতে বা বর্তমান আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৩৮ থেকে ১৮৮২-৮৩ পর্যন্ত পুরান ও নতুন হাভেলিতে একযোগে রাজকার্য চলত।

আগেই বলেছি, ১৯৫৬ সালের বন্যার ইতিহাস শুনেছি। কিন্তু ১৯৮৩ সালের বন্যা দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেবার বন্যাত্রাণে অর্থ সংগ্রহ করতে রাজ্যে এসেছিলেন রবি ঘোষ, অনুপ কুমার সহ সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। বন্যাও যে রাজনীতির অনুষঙ্গ হতে পারে সেবার অনুধাবন করা গেল। বন্যার কারণ সম্পর্কে দুটি অভিযোগ এসেছিল। এক) সরকার প্রচুর রাস্তাঘাট বানিয়েছে, ফলে জল আটকে ছিল। বেশি বৃষ্টিপাতে সেসব রাস্তা ভেঙ্গে বন্যা হয়েছে। মানুষের ফসলের ক্ষতি হয়েছে। দায়ি সরকার। দুই) সরকার রাবার বাগান গড়ে তুলেছে। রাবার গাছ বৃষ্টি টেনে আনে। ফলে বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ার পেছনেও দায়ি সরকারের সিদ্ধান্ত। পরবর্তী সময় গবেষকরা দেখিয়েছেন রাস্তা, বাঁধ হওয়ার ফলে লাভ হয়েছে। জল ধারণ ক্ষমতা বেড়েছে। আর ত্রিপুরায় একলক্ষ হেক্টর অবধি রাবার. চাষে পরিবেশের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

সেবার অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে রানিরবাজারে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে জল বইছিল। এখন যেখানে রানিরবাজার টাউন হল তার কাছ দিয়ে। পার হতে গিয়ে স্রোতে ভেসে গেলাম। সঙ্গীরা ধরে টেনে না তুললে আজ নাম থাকতো পারিবারিক ইতিহাসের পাতায়। সে সময় প্রচুর রাস্তাঘাট ভেঙ্গেছিল, ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ভেঙ্গেছে নদী বাঁধ, জলাশয়ের বাঁধ। সেবার রাজ্যের কর্মচারীরা জীবন বাজি রেখে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পুনর্গঠনে ভূমিকা নেন। ছিলেন গণ-আন্দোলনের কর্মীরা। কম সময়ে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর পুনঃনির্মাণ হয়েছে। মানুষ আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসেন। সরকারের মানবিক দৃষ্টিকোণ ছিলএর পেছনে মূল কারণ। ১৯৯৩ , ২০০৩ সালেও এরকম জলমগ্ন হয়েছে আগরতলাসহ প্রায় সারা রাজ্য। এছাড়া প্রতিবছরই অতিবর্ষনে ফসল হানির ঘটনা ঘটেছে। বারবারই সরকারের জন্যই বন্যা হয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে। কেউ কেউ তো এমনও অভিযোগ করেছে, 'ম্যানমেড' বন্যা বলে। এটা রাজনৈতিক বক্তব্য! সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছিল ভূমিকম্প থেকে সুনামি। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর। তাতে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যাণ্ডসহ ১২টি দেশে অন্তত দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। সুনামির প্রভাব ত্রিপুরায় পড়েছিল। সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস ১৭ মিটার উপরে উঠেছিল। ২০০৯ সালে হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় আয়লা। ২০১৮ সালে জলমগ্ন আগরতলার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ২০২০ সালে আম্ফান ঝড়েও ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের। ২০২৩ সালের ১৬-১৭ নভেম্বর মিধিলি ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের। ২০২৪ সালের মে মাসে রেমাল ঝড়ে ক্ষতি হয় কৃষকদের। সেই দুই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি। এরমধ্যে এবারের বন্যা সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যায়। এবারকার ভয়ংকর ক্ষয়ক্ষতি থেকে মানুষের উঠে দাঁড়ানো মুশকিল যদি না সরকার আন্তরিক ও সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের পাশে না দাঁড়ায়।

এবছরের বিধ্বংসী বন্যায় বিপন্নদের উদ্ধার থেকে ত্রাণে সবেতেই মনুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সংবেদনশীলতা ও দায়বদ্ধতার অনন্য নজির গড়েছেন। তবে সময়মতো আবহাওয়া দপ্তর যে সতর্কবার্তা দিয়েছিল তাতে গুরুত্ব দেয়নি সরকার। সতর্কতা ও ব্যাপক প্রচার, মানুষকে নিরাপদ স্থানে নেওয়ার আগাম ব্যবস্থা করলে জীবন ও সম্পদ হানি কম হতো। সরকার পৌঁছাবার আগে বন্যার্ত মানুষের সেবায় নেমে পড়েছেন, সাধারণ মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিরোধী দলগুলো। এক একটি পরিবারের সবজি, ফল-ফুলবাগান, বাড়িঘরের আসবাবপত্র, কাপড়-চোপর গবাদিপশু, মুরগি খামারসহ আয়ের প্রায় সব উৎস শেষ হয়ে গেছে। মানুষকে তো বন্যার জল কমার পরই শিবির থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তারা খাবে কি? স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ত্রাণ দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের জন্য চাই পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ। বন্যার দিনগুলোতে অমরপুর দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে সাড়ে ছয়শ মানুষকে আশ্রয় দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল গণ আন্দোলনের পক্ষে। বাড়ি যাওয়ার সময় কাপড়, বইপত্র, ওষুধপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। এরকম বিলোনীয়া করুণা রায় ভবনেও ৫০টি পরিবার আশ্রয়, খাবার পেয়েছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো অন্তত ১৭ লক্ষ মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে দিনের পর দিন। বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর এখনও দিচ্ছে। এবারের বন্যায় এক অথর্ব অবস্থা দেখা গেছে প্রশাসনের?

কিন্তু ত্রিপুরার বন্যা নিয়ে বাংলাদেশে হৈচৈ হয়েছে। ডম্বুর বাঁধের জল ছেড়ে দেওয়ায় নাকি ফেনিতে বন্যা হয়েছে। এনিয়ে বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদ্দের মধ্যে কেউ কেউ প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন। তাদের কিছুটা এখানে তুলে দিচ্ছি। বাংলাদেশের জলসম্পদ বিশেষজ্ঞ ডঃ আইনুন নিশাত (এমিরেটস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়) লিখেছেন, "ভৌগোলিক ও ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় চলমান বন্যায় সোশাল মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে একটি কথা — গোমতি নদীর ডম্বুর বাঁধ ছেড়ে দেয়ায় ফেনি জেলা ডুবে গেছে। এই দাবিটি সত্য হতে পারে কিনা দেখা যাক। গোমতি একটি নদী, তার একটি বেসিন আছে। সেই বেসিনে বৃষ্টি হলে গোমতী নদী দিয়েই পানি নিচে নামতে হবে। নদীতে বাঁধ দেয়া হলে সেই বেসিনেই হ্রদ তৈরি হবে (ডম্বুর হ্রদ)। আবার বাঁধের রেগুলেটর খুলে দিলে সেই পানিও গোমতি দিয়েই নামতে চেষ্টা করবে। নদীর ধারণ ক্ষমতার বেশি হয়ে গেলে গোমতীরই দুইপাশ (ফ্লাডপ্লেইন)

প্লাবিত করবে। প্রশ্ন হলো, কোনভাবে কি ডম্বুরের ছেড়ে দেয়া পানি মুহুরী বা ফেনি নদীর বেসিনে চলে আসতে পারে? পারে, যদি সেই পানি গাঁজা খেয়ে দুই বেসিনের মাঝখানের পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে এবং ওপাশ থেকে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এপাশে চলে আসতে পারে। যদি পানির পক্ষে পাহাড় ডিঙ্গানো অসম্ভব হয়, তাহলে ডম্বুর লেকের এক ফোঁটা পানিও মুহুরী বেসিনে আসা অসম্ভব। ফেনির উত্তরাংশে যে বন্যা, সেটা মুহুরী (বিলোনিয়া) এবং ফেনি (সাব্রুম) নদীররই বেসিন থেকে আসা পানি।

তাহলে ডম্বুরের পানি কই গেলো? ডম্বুরের সবচেয়ে কাছের বাংলাদেশী অংশটা খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদীর বেসিন। সেখানেও তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ মাঝখানে উঁচু পাহাড়। তাহলে সেই পানি কোথায় যাচ্ছে? ডম্বুরর বাঁধের বাইরে (ডাউনস্ট্রিমে) ভারতেরই বেশ কয়েকটি জনপদ আছে (নতুন বাজার, চেলাগাং, ডালাক বাজার, অমরপুর, রাঙ্গামাটি, বীরগঞ্জ, মহারাণি, উদয়পুর জেলা সদর, মেলাঘর, ইন্দিরা নগর, সবশেষে সোনামুড়া)। এরপর গোমতি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কাজেই এই পানি ভারতের ওইসব জনপদকে প্লাবিত করে বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চলকে প্লাবিত করবে। কুমিল্লার চেয়ে নিচু এলাকা পর্যায়ক্রমে চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর এবং নোয়াখালী। কাজেই গোমতির পানি কুমিল্লাসহ এই চারটি জেলার উপর বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় ভূমিকা থাকবে, কিন্তু ফেনির নয়। বড় জোর ফেনির সোনাগাজী ও দাগনভূঁইয়ায় গোমতির পানির কিছুটা প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। পরশুরাম, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া এবং ফেনি সদরের বন্যা প্রধানত ফেনি, মুহুরী বেসিনের পানি, গোমতির নয়।

গোমতীকে বলা হতো কুমিল্লার দুঃখ। কিন্তু এখন বন্যা হয় না। কারণ হচ্ছে বাঁধ পানি ধরে রাখে। এই বাঁধটা ভারত করেছিল তাদের উপকারের জন্য, তাতে আমাদেরও কিছু উপকার

জলমগ্ন অমরপুর। ২০২৪ সাল।

হয়েছিল। চট্টগ্রাম-রাঙ্গুনিয়ায় আগে প্রতিবছরই বন্যা হতো, এখন হয় না। কারণ কাপ্তাই বাঁধ ওই পানি ধরে রাখে। ৩০ বছরেই আমরা কী করে ভুলে গেলাম যে প্রতিবছরই বন্যা হতো! আমার ধারণা গোমতীর অবস্থা কী, তা ভারত জানিয়েছে। তিন-চার দিন আগে থেকেই আমাদের বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্রগুলো এই তথ্য জানিয়ে আসছে। আমরা বিষয়টি দেখিনি, পূর্বাভাসের তথ্য নাড়াচাড়া করি না'।

মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরায় ব্যাপক ধ্বংস চালিয়ে গোমতী জল বাংলাদেশের কুমিল্লায় গেছে। অস্বাভাবিক বৃষ্টি হলে বন্যা হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। এটা প্রকৃতির নিয়ম। একসময় অবিভক্ত ভারতের অংশ আজকের বাংলাদেশ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশরা ভারতকে ভাগ করে যে স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করে গেছে এটা তারই ফলশ্রুতি। কিন্তু যেকোন বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থাকা উচিত। এবছরেরর আগস্ট মাসের বন্যায় বাংলাদেশের কাপ্তাই বাঁধের জলও উপচে পড়েছে। এই বাঁধও দেওয়া হয়েছে ভারতের মিজোরাম রাজ্য থেকে উৎপন্ন কর্ণফুলী নদীতে। এ নিয়ে কোন রা শব্দ নেই। গোমতীর উপচে যাওয়া জল শুধু নিয়ে অবৈজ্ঞানিক প্রচার করা হয়। গুজব ছড়ানো হয়েছে। গুজব আজ আক্রমণেরও হাতিয়ার। গুজব ছড়িয়ে মানুষ হত্যা, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া আজকাল এই উপমহাদেশে সাধারণ ঘটনা। ত্রিপুরায়ও এই সংস্কৃতি নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। নেতিবাচক শক্তিকে দূরে সরিয়ে বন্যা বিধ্বস্ত ত্রিপুরাকে পুনর্গঠনে সংবেদনশীল মানুষকে যেমন ভূমিকা নিতে হবে তেমনি সমাজে গুজবের জেরে হত্যা, বাড়িঘর পোড়ানোর বিরুদ্ধেও লড়াই চালাতে হবে। প্রসার ঘটাতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির। আর আগরতলাকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে হলে চাই মাষ্টার প্ল্যান। বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

ডাইরীর ছেঁড়া পাতা!

নন্দিতা দত্ত। আগরতলা।

আজকাল খবরের কাগজ পড়তে একদমই ভালো লাগেনা। রেডিও বা টিভির খবর শুনতেও ইচ্ছে করেনা। ওমা এ কি কথা? অনেকেই বলেন কি সমস্ত খবর, কিন্তু সবকিছু সবিস্তারে দেখেন এবং বর্ণনাও করেন। দেশে দুনিয়ার খবর জানলেই মন খারাপ হয়, নিজেকে ধিক্কার দিতে হয় এ কী সমাজ রেখে যাচ্ছি আমরা?

আজ থেকে আগামী পাঁচ বছর পর পৃথিবীর কি চেহেরা হবে জানিনা? তবে গত পাঁচ বছরে প্রযুক্তির উন্নতিতে একটা জিনিস জলের মতো স্বচ্ছ আমরা যা দেখি তা বলিনা, যা দেখিনা তাই বলি। মানে কথাটা কি রকম হয়ে যাচ্ছে না। আসলে আমরা এমনই হয়ে গেছি যা দেখি বা শুনি প্রশ্ন যদি করি উত্তর পাইনা। এই কথাটা বলার একটাই কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় যা দেখি যা শুনি তা সত্য মিথ্যা যাচাই না করে অনেক সময় সেই কথাগুলোই বমি করি। অসলে বোধ হয় কোথাও একটা ভয় কাজ করে, দরকার কি প্রশ্ন করার যেমন আছে চলুক না। নিজের গায়ে আগুন না লাগলে আমরা সমাজের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে বলি একি সমাজ? এই সমাজটা কি জড়বস্তু ? না... আমার আপনার মত কিছু মানুষের যাপিত জীবনের প্ল্যাটফর্ম। আমাদের চিন্তাভাবনাগুলোই তো সমাজ নামক বাক্সটার প্রাণ।

এই সমাজ নামক বাক্সটায় ভরা আছে প্রতিযোগিতা, অহংকার, অন্যকে নীচু দেখানোর মানসিকতা, গার্হস্থ্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক হিংসা, আত্মভিমান এবং মেধা নিয়ে গরিমা (সব ধরনের মেধা), অসততা, চতুরতা, স্তাবকতা আর প্রাণে মেরে ফেলাসহ আরোও অনেক কিছু। সাধারণ নাগরিক হিসেবে এগুলোর প্রতিফলন চোখে পড়ে মস্তিষ্কে ক্রিয়া হয় তারপর সব ঘোলাটে হয়ে যায়, প্রশ্ন করি না। এ নিয়ে বিতর্ক খোলা আলোচনা হওয়া খুব দরকার। সমাজের সব অংশের মানুষকে নিয়ে সরাসরি আলোচনা। যেমন পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিযোগিতা হয়, তেমনি এই বিষয়েগুলো নিয়ে আলোচনায় বেরিয়ে আসবে সমাধানের রাস্তাও। তবে খাপ পঞ্চায়েত টাইপের কিছু অবশ্যই নয়। যৌথ পরিবার নেই তো কি হয়েছে? আমাদের ফ্ল্যাট কালচার তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটই এখন এক একটি পাড়া। আমার ঘরের সমস্যা নয়, আমি বলবোনা, বা তার ছেলেটা বা মেয়েটা বখে গেছে বলে এড়িয়ে গিয়ে নয়। কাজটা সবার।

ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনে বড় হয়েছিলাম পূর্ববঙ্গের (অবিভক্ত ভারতের) মেয়েদের সাহস খুব বেশী। এই কথাটা বলার পেছনে কারণ হলো পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা পরিবারগুলোর মেয়েরা লড়াই করে নিজে দাঁড়িয়েছে পরিবারকে দাঁড় করিয়েছে। এ রাজ্যের মেয়েদের চেতনার দরজা খুলেছিল তাঁদের লড়াকু মানসিকতা। কিন্তু এখন রাজ্যের মেয়েদের উপর প্রতিদিন যে ধরনের নির্যাতনের কথা শুনি তাতে একটা কথা মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েরা সেই সাহসটা দেখাতে পারছেনা কেন? কারণ হিসেবে যেটা মনে হয় গাঁহস্থ্য হিংসায় ঘরের ভেতর লড়াই করতে করতে কোথাও যেন থমকে গেছে ওরা। মেয়েরা হয়তো ভাবছেন নিজের পায়ের তলার জমিটাই তো শক্ত নয় অন্যের জন্য লড়াই করব কখন? মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও কমবেশী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা নেশার কারণে অত্যাচারিত হচ্ছেন।

আগে যে নির্যাতন বা অত্যাচার যে তকমাই দিইনা কেন তা কিল, চড়, ঘুসি ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করলাম পুরুষ বা মহিলা উভয়কেই সম্মিলিত আক্রমনে নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে। এধরনের উন্মত্ততা, হিংসা কোথা থেকে এলো? এত বদসাহসের জন্ম কি কারণে? সমাজ নামক বাক্সটাকে মান্যতা দিয়ে আন্তরিকভাবে মানুষকে ভালবাসা ও সম্মান করার দিন কি শেষ? এটাতো বিশ্বাস করতে পারছিনা! কারণ সম্প্রতি বন্যা দুর্গতদের পাশে নানা অংশের সম্মিলিত মানুষ যেভাবে দাঁড়িয়েছেন, বিশেষ করে যুব ও কিশোর প্রজন্ম ত্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাকে কি হুজুগ বলবো? মোটেই না। ওদের আন্তরিক প্রয়াশ অন্ধকারে আশার আলো জাগিয়েছে। বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে এখনও সব ফুরিয়ে যায়নি।

সমাজ স্থির জল নয়। সমাজের প্রয়োজনেই গতিপথপাল্টানো সমাজ কি? ন্যায়নীতি, সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সহযোগিতায় সময়ের হাত ধরে যাকে আমরাই বর্তমানে গড়বো তা ভাবীকালের ইঙ্গিত বহন করবে। সেই ভাবীকাল কি আমরা দেখতে পাচ্ছি?

জীবন, তুমি পাশে থাকো

শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য । আগরতলা।

মেয়েটি প্রত্যয়ী। তার কাছে 'না' নামক কোনও শব্দ অভিধানে নেই। জীবনের চলার পথে যে চলন্তিকাকে সে মেনে চলে সেখানে শুধুই মনগড়া কল্পনা। জীবনের ক্ষোভ, অভিমান এবং দুঃখের জটিলতাকে একপাশে সরিয়ে, প্রতিনিয়ত মেয়েটি নিজেকেই নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে।

মেয়েটি যখন জানতে পারে তার শরীরে এইচআইভি, তখন তার বয়স খুবই কম। গরিব ঘরে জন্ম তার। বাবা দিনমজুরের কাজ করেন। খুব কষ্ট করে মেয়েটিকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াতে পারেন। মেয়েটি পড়তে চেয়েছিল। মহাবিদ্যালয় পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার পরে আরও পড়তে চেয়েছিল। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন ছিল তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কিন্তু অভাবের তাড়নায় মাত্র আঠারো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পিঁড়িতে বসেও মেয়েটি নিজের বাবাকে বলেছে —'বাবা, আমি তো আরেকটু পড়তে চেয়েছিলাম।' পাশ থেকে এক আত্মীয় রাঙাচোখে মেয়েটির দিকে তাকালে সে পুনরায় সেদিন বিয়ের মন্ত্রতে মন দেয়। মেয়েটি বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়।

বিয়ের পর প্রতিটি মেয়ের মনে যা থাকে, ওরও ঠিক তা-ই মনে হতে থাকলো। গোছানো সংসার, সন্তান জন্ম দিয়ে নিজেকে মা ভাবার আহ্লাদ। হলো। বিয়ের প্রথম দু'বছর আদরে আহ্লাদে কেটে গেলো। জন্ম হলো এক ফুটফুটে শিশুর। শিশুটির তিন মাস বয়স যখন, হঠাৎ করেই মেয়েটির স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই তখন থেকেই মেয়েটির জীবনে এক ঘনঘটা অন্ধকার। মেয়েটি আদরে-সোহাগে তার স্বামীকে বোঝাতে শুরু করেন, শরীর খারাপ হলে ডাক্তার দেখাতে হবে! আর সেখানেই বাধ সাধে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তাদের সম্মিলিত বক্তব্য একটাই, কবিরাজ দেখাতে হবে। এই করে কয়েক মাস কেটে যায়। মেয়েটি হঠাৎ একদিন জানতে পারে, তার পরাণপ্রিয় স্বামীর ইচআইভি হয়েছে। এই কথা সরাসরি সে জেনে যায় এক ডাক্তার বাবুর মুখ থেকেই। ডাক্তার মাথায় হাত বুলিয়ে মেয়েটিকে বললেন —'তুমি এবং তোমার সন্তানের এইচআইভি পরীক্ষা করতে হবে। তোমার স্বামীর শরীরে এইচআইভি জীবাণু পাওয়া গেছে। ভয় পেয়ো না। সাবধানে থাকতে হবে।' ডাক্তারের কয়েকটা লাইন মেয়েটির জীবন উলট পালট করে দিলো। মেয়েটি হাসপাতালে গিয়ে নিজের এইচআইভি পরীক্ষা করায়। ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় নিজেই নিজের রিপোর্ট আনতে যেতে চায়নি সে। নিজের শ্বশুরমশাইকে বলেছে, হাসপাতাল থেকে রিপোর্টটি নিয়ে আসার জন্য। শ্বশুরমশাই ফিরে এসে বলেন, ওর কিছুই হয়নি! মেয়েটি রিপোর্ট দেখতে চায়, বিনিময়ে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং স্বামীর কাছ থেকে গালিগালাজ খায়। শুরু হয় গায়ে হাত তোলা। মেয়েটি তবুও নাছোড়বান্দা। তার দৃঢ়চেতা মন তাকে সকাল-বিকাল খালি বলে, রিপোর্টটা একবার নিজের চোখে দেখতে হবে। মেয়েটি নিজের বাবাকে সব খুলে বলে। ধর্মনগর হাসপাতালে গিয়ে পুনরায় এইচআইভি টেস্ট করে সে জানতে পারে, তার শরীরেও এইচআইভি জীবাণু রয়েছে। ডাক্তার বুঝিয়ে সবটা বলেন, ওষুধ খাওয়ার কথা বলেন। মেয়েটি ওষুধ খেতে চায়। সেখানেও বাধা আসে। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় একটা করে ওষুধ নিজের ছেড়া বালিশের ভেতর লুকিয়ে রাখে মেয়েটি। সঙ্গে ছোট শিশুটির যত্ন নেওয়া। শিশুটির বয়স যখন আট মাস, তার স্বামী অসুস্থ থাকতে থাকতে হঠাৎ করে মারা যান। সমাজের চোখে মেয়েটি বিধবা হলেন। শ্বশুরবাড়ির মায়া ত্যাগ করে মেয়েটি নিজের বাপের বাড়িতে চলে আসেন। শুরু হয় অন্য লড়াই। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। শিশু সন্তানটিকে সুস্থ রাখার লড়াই। মেয়েটি ধীরে ধীরে স্বামীর প্রয়াণের শোক ভুলে পার্লারের কাজ শিখতে শুরু করেন। পাশাপাশি সদ্য জন্মানো শিশুর যত্ন। মেয়েটি এখন প্রতিদিন স্বপ্ন দেখে, ওর মতো যারা এইচআইভি রোগে আক্রান্ত, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সে দূত হয়ে কাজ করবে। মানুষকে বোঝাবে, জীবন একটাই। জীবনের মায়া-মমতা নিজের মতো করে এক ভবিতব্য রচনা করে। মেয়েটি এখন প্রতিদিন নিজেই নিজেকে বলে — জীবন, তুমি আমার পাশে থাকো।

মেয়েটিয় নাম পপি সিনহা। ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ির এই মেয়েটি আমাদের প্রত্যেকের ঘরের মায়েদের মতো। লড়াকু। নিজের বোধে দৃপ্ত।

পুজো পরদেশে, পরবাসে

শক্তি দত্ত রায়। কোলকাতা।

আমাদের মতো পরিযায়ী মানুষের কাছে পরবাস বলে কিছু হয় না। একটু বেশিদিনের জন্য দূরে গেলে নিজের বাস্তুভিটাই মনে হয় পরবাস। যেখানে কিছু দিন বেশি থাকি সেই বাস হয়ে ওঠে নিজবাস। পরবাস নিজবাস দুইই এখন বাসা। এমনিতেও আমরা ভারতীয়রা বা বাঙালীরা দেশের ধারণা একটু ধোঁয়াটে করে তুলেছি। কোলকাতায় কাজ করে যে গৃহপরিচারিকা সে দুদিনের ছুটি চায় লক্ষ্মীকান্তপুরে দেশে যাওয়ার জন্য। কর্ণাটক প্রবাসী মেয়ে ক্যুরিয়ারের প্যাকেট খুলে দেখে মায়ের যত্নে পাঠানো জুমের বিন্নি ধানের চিড়ে-তাতে তার দেশের গন্ধ জড়িয়ে থাকে। কখনো কর্মসূত্রে, কখনো স্বভাবদোষে, কখনো হেথা নয় হেথা নয় আর কোনখানের ডাকে আমার বেশিটাই পরবাস, আবার পরবাসই নিজভূমি।

অনুরোধ করা হয়েছে পরবাসে পূজা বিষয়ে লিখতে। সুতরাং চেষ্টা করছি পাসপোর্ট ভিসায় মার্কামারা পরবাস, পরদেশের দুই একবার অল্প দেখা পূজার অভিজ্ঞতা বলার। বেশি দেখা বা জানা হয়নি। নিতান্ত ওপর ওপর।

ধারণা তো খানিকটা ছিলই দেশের কাগজপত্রে তো আগেই পড়েছি আমেরিকার পূজার অনেক কথা। যেমন খুব কম জায়গাতেই দুর্গাপূজার তিথি অনুযায়ী পূজা হয়। লংউইক এন্ডে দুদিন বা তিনদিনে, এমন কি কখনও কখনও একদিনেও সপ্তমী অষ্টমী নবমীর পূজা করা হয়, ছুটির দিনে। স্কুল বা কোনো ভাড়া করা বাড়িতে পূজার আয়োজন করা হয়। ছোট পূজার আয়োজকেরা অনেক সময় বড় সংগঠনের পুরানো প্রতিমা সংস্কার করে পূজা করেন। সত্যিই তাই। কিন্তু দূরে গেলে শিকড়ের টান প্রবল হয়, তাই হয়তো, প্রবাসীদের আন্তরিকতার ও একাগ্র নিষ্ঠার কোন ঘাটতি নেই।

আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা নিউ জার্সির বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটির পুজো। বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি ভুরহিস-এর প্রতিষ্ঠাতারা দীর্ঘদিনের প্রবাসী। আজকের আইটি যুগ শুরু হওয়ার আগে, ছয় থেকে আটের দশকে যাঁরা আমেরিকা গেছেন, তাঁরাই এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। ঐ অঞ্চলের কাছাকাছি রাটগার্স, প্রিন্সটনের মত নামী দামী বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন মেধাবী বাঙালীদের অন্যতম কাঙ্খিত গন্তব্য। সেই সময় বিশ্ব অন্যরকম ছিল, যোগাযোগকে হাতের মুঠোতে বন্দী করা সম্ভব হয়নি। একটি শহরে বাঙালী তো দূর অস্ত, আর কোন ভারতীয় পরিবারই হয়তো নেই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' বা মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'বিবর্ণ তুষারে' সেই সময়ের জীবনের চমৎকার কিছু মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে। এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীঅরুণোদয় সাহার দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিকটির কথাও মনে পড়ে গেলো। চোখ ধাঁধানো দ্রুতগতির পাশ্চাত্যে সফল পেশাদার মেধাবী যুবক যুবতীরা বুকের মধ্যে স্বদেশকে আগলে রেখে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খুলেছিলেন এই সংগঠন। দেখলাম সরকারীভাবে১৯৭৮ সালে রেজিস্টার্ড।

সে যাই হোক, বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি ভুরহিস-এর পুজোর আয়োজন হয়েছে মেডফোর্ড শহরের লেনাপি হাইস্কুলে। আয়োজন, উদ্যোগ ও উদ্যমে নবীন প্রবীনে কোন ভেদাভেদ নেই। জাঁকজমক মন্দ নয়, তবে স্কুলের অডিটোরিয়াম ভাড়া করে, সুতরাং শৃংখলা, পরিচ্ছন্নতার দিকে উদ্যোক্তা থেকে দর্শনার্থী সকলের মনোযোগ। বিল্বষষ্ঠী পূজা যেদিন হলো সেদিন সন্ধ্যায় দেখলাম সমস্ত আয়োজন নিখুঁত নিখুঁত ছিমছাম। লালপাড় গরদ বা উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরা মহিলাদের উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি আর ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিত ভদ্রলোকদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে মাদুর্গা স্টোররুম থেকে বেরিয়ে বেদিতে স্থাপিত হলেন। যথারীতি ষষ্ঠীপূজা হলো। হালকা জলযোগ হলো। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় নানা সুখাদ্যের সঙ্গে ঝালমুড়ি অবশ্যই থাকতো, সেদিনও ছিল। অনেকের সঙ্গে পরিচয় বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

আমেরিকার পূজায় আমাদের যা খুব বেশি মনযোগ কেড়ে নিল তা হচ্ছে স্বতস্ফূর্ত আনন্দ আর শৃঙ্খলাবোধ, পরিচ্ছন্নতার মেলবন্ধন। দেশের যেকোন অনুষ্ঠানে আমরা এই ক্ষেত্রে কেন যে ফেল করি কে জানে।বিদেশে আবার আমরাই ফার্স্ট ডিভিশন। সবাই আনন্দ করছে। শিশু কিশোরের সংখ্যা ও কম না। কিন্তু চেঁচামেচি ঝগড়ার নামগন্ধ নেই। একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর ঢাক রাখা আছে বাচ্চা বুড়ো যার শখ হয় গিয়ে বাজাচ্ছে। আমাদের গৃহকর্তা নাকি অল্পবয়সে বনমালীপুরে পূজা প্যান্ডেলে ঢাক বাজাতেন। এখানে

মহানন্দে ঢাকে কাঠি দিলেন। শীতের দেশ। অক্টোবরের সকালে দিব্যি ঠাণ্ডা। তিনদিনের জন্য হল পাওয়া গেছে। সপ্তমী অষ্টমী একদিনে আর নবমী দশমী একদিনে আর নবমী দশমী একদিনে সারা হবে। খুব ভোর থেকেই ফল মিষ্টি ভোগ, অন্নভোগের আয়োজনে ব্যস্ত অনেক মহিলা পুরুষ। খাওয়া দাওয়ার বিপুল আয়োজন। বলরামের মিষ্টি, গাঙ্গুরামের সন্দেশ, পুঁটিরামের দই সবই দোকান নিয়ে হাজির। অষ্টমীদিন আমিষ খাওয়া। সকাল বিকাল লোভনীয় স্ন্যাকস, চা, কফি। যারা ঝাল মোটে খায়না বা শিশু তাদের ও আলাদা ব্যাবস্থা। আমরা যাকে থার্মোকল বলি আমেরিকায় তার নাম ফোম, অর্থাৎ স্টাইরোফোমের সংক্ষিপ্ত রূপ। ফোমের থালা বাটি গেলাস, ব্যবহারের পর আবর্জনার নির্দিষ্ট পাত্রে-কেউ ভুল করে মেঝেতে ফেলে দিলেও পরে যার চোখে পড়ছে সে জায়গামত ফেলে দিচ্ছে। পুরোহিত সৌম্যদর্শণ। নিষ্ঠা নিয়ে পূজা করলেন। হোম অঞ্জলি সব খুব সুন্দর ভাবে হলো। হাসিখুশিতে ষষ্ঠী সপ্তমীর পুজো হয়ে গেল।

এইসব পুজোগুলির আরেক আকর্ষন সমাহার। স্থানীয় ভাবে যাঁরা ভারতীয় হস্তশিল্প, বাংলা বই বিপণন করেন-তাঁরা এই পুজোগুলিতে স্টল দেন। কেউ হয়তো বাঙালী ধরনের খাবার বানাতে ভালোবাসেন - পুজোর তিনদিন তার টেবিলে জমজমাট ভিড়! তবে সবথেকে বড় আকার্ষণ শাড়ির! শাড়ি এবং ভারতীয় ডিজাইনের গয়নার দোকানগুলিতে বাৎসরিক ভিড়-গাড়িয়াট কিংবা হকার্স কর্নারে পুজোর কেনাকাটা করতে না পারার দুঃখ মিটিয়ে নিতে বঙ্গললনারা উদগ্রীব!

পরের দিন নবমী দশমী পালিত হবে। তার আগে অষ্টমীপূজার দিন আমিষের ব্যবস্থা। স্বাভাবিক ভাবেই অনেকেই খুশি। মাছে ভাতে বাঙালি। সারাদিনব্যাপী সায়ন সুকন্যা দিঠি সহ আমরা পূজা প্যান্ডেলেই ওখানকার নূতন পুরনো অধিবাসীদের সঙ্গে আড্ডা দিলাম অঞ্জলি দিলাম।

বিদেশে বাঙালি মাত্রই সজ্জন কথাটা মিথ্যা নয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বিসর্জনের নিয়ম যথারীতি পালিত হলে মা দুর্গার প্রতিমা প্ল্যাস্টিকে মুড়ে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের ব্যাবস্থাপনায় ষ্টোরে ঢুকলেন। আগামীবার হয়তো যথোচিত সংস্কারের পর আবার পূজিত হবেন। অনেক সময় ছোট ক্লাবগুলি পুরনো ঠাকুর কিনে নেন। বিসর্জনের পর শান্তিজল রক্ষাবন্ধন মিষ্টিমুখ কিচ্ছুবাদ গেলনা। এয়োতীরা লালপাড় গরদ পরে সিঁদুর খেললেন। অনেকেই বাড়ি থেকে মিষ্টি পিঠা নাড়ু তৈরি করে এনে ভোগ দিয়েছেন। ওদেশে নিজের কাজ নিজে করতে হয় বলে প্রায় সকলেই কর্মপটিয়সী।

পুজোর শেষে বিজয়া সম্মিলনীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানেও নবীন প্রবীনের অনাবিল মেলবন্ধন। মন জুড়িয়ে গেল অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের দেখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের আমেরিকান নবীন প্রবীনের অনাবিল মেলবন্ধন। মন জুড়িয়ে গেল অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের দেখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের আমেরিকান নবীন ও নিতান্ত কচিকাঁচারা কী অসম্ভব যত্নে বাঙালীর সঙ্গীত কবিতা সংস্কৃতিকে হৃদয়ে বহন করছে তা দেখলে আশা জাগে।

বিদেশের এই বারোয়ারি বা ঘরোয়া উদ্যোগ যাই বলি, পুজোয় সব থেকে ভালো লেগেছে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অমল ধারাটি। বাঙালী ছেলের আমেরিকান স্ত্রী পুজোর দিনে গুছিয়ে গরদের শাড়ি পরে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠা মনোযোগ চোখ টেনে নিল। প্রবাসে বড় হওয়া সদ্য তরুণী মা বাবার সংস্কৃতির শিকড়কে সম্মান করে শিখে নিচ্ছে ইংরেজি হরফে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা। এর পাশাপাশি দেখেছি দেশের তিথি মেনে ভারত সেবাশ্রম বা আনন্দ মন্দির কালিবাড়ির পুজো। একদিন সেখানে প্রসাদও পেয়েছি।

আরেক বছর গেলাম আটলান্টায়। সেখানে কলকাতা ও বাংলাদেশের বাঙালীদের নানান সংগঠন মিলিয়ে গোটা ছয়েক দুর্গাপুজোর আয়োজন। জাঁকজমক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কোন কিছুরই কমতি নেই। যেন দেশের মতই এক প্যান্ডেল থেকে আরেক প্যান্ডেলে পুজো দেখতে যাওয়া। শুধু রিক্সা চেপে যাওয়ার উপায় নেই, এইটুকুই যা তফাত!

২০১৬ সাল। আমরা তখন নিউ জার্সির উত্তর প্রান্তে উইহকেন শহরে। জানালা দিয়ে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের আলো দেখা যায়। ঠিক হলো স্নেহভাজন ববি আর মৃদুলের আতিথ্যে পুজোতে ভার্জিনিয়া যাবো। ওদের একটি ছেলে সাইরাস। ববি, সায়ন ও সুকন্যা সহপাঠী, বন্ধু। মৃদুল গোপ উদয়পুরের ছেলে। ভার্জিনিয়ার অ্যাশবার্ন শহরে ওদের খুব সুন্দর বাগান ঘেরা বাড়ি। তেমনি সুন্দর ওদের ব্যবহার। দুজনেই উদ্যমী ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। মৃদুলের সফল সঙ্গতে ববি নিজের জোরে আজ একজন সফল উদ্যোগপতিও বটে। ওর বাণিজ্য একাধিক মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত । ববি আমার জন্য ঘর গুছিয়ে রেখেছিল। শাড়ি ব্লাউজ এমনকি সেফটিপিন অবধি গুছিয়ে রেখেছিল যাতে কোন অসুবিধা না হয়।

ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন ডি সি এইসব জায়গা ভারতীয় তথা বাঙালীদের পুরনো আবাস। আমেরিকার রাজধানী অঞ্চল বলে কথা। নিসর্গ সুপরিকল্পিত, সুদৃশ্য, মানুষ সুভদ্র, সুবেশ। পুজো হয় একাধিক।

ভার্জিনিয়াতে স্থায়ী দুর্গামন্দির রয়েছে। বাঙালী সংগঠনের পুজো হয় গেদার্সবার্গ হাই স্কুলে। তার কাছাকাছি আমাদের প্রিয় মানুষ মিতা ও দিব্যেন্দুর বাড়ি। মিতাদের বাড়িতে আমরা আতিথ্যভোগ সে এক অন্য সুখস্মৃতি।

আমেরিকায় শিউলি ফুল দেখিনি। তবে প্রচুর পদ্ম আর সম্ভবত হাওয়াই থেকে আসা প্রচুর জবাফুলও ছিল পূজার থালায়। এছাড়া ছিল যার যার নিজের বাগানের ফুল। অবাক হয়েছি কাশফুলের প্রাচুর্যে। শরৎকালে হাইওয়ের দুই পাশ, শহরের বুলেভার্ড ওভারব্রীজের নীচের একটুখানি জায়গা ভরে ওঠে কাশফুলে। ছবিতে দেখা ধপধপে সাদা নয়, একটু ধূসর। হয়তো গাড়ির ধোঁয়ার ধুলোমলিন। তাই তিথি ভিন্ন হলেও মেঘের রথে শারদলক্ষ্মীর নির্ভুল পদচ্ছাপ চিনে নিতে অসুবিধে হয়নি এই সাত সাগর পাড়ের পরদেশে, পরবাসে।

শারদ সম্মান ২০২৪

ব্যবস্থাপনায়
হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা
উদয়পুর শাখা ও সাউথ জোনাল কমিটি

কোশীনদীর ওপাড় থেকে...

নবেন্দু পাল। লুসিয়ানা, আমেরিকা।

অক্টোবর মাস। গরমের প্রকোপ কমে গিয়ে বাতাসে একটু একটু করে ঠান্ডার আমেজ আসতে শুরু করেছে। আমেরিকার মধ্য অতলান্তিক (Mid-Atlantic) রাজ্যগুলোতে আলোর সমারোহ। উত্তরের মেইন (Maine) রাজ্য থেকে দক্ষিনের জর্জিয়া অব্দি অ্যাপেলেশিয়ান পর্বতমালা (Appalachim Mountain Range) জুড়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাদামী হলুদ ও সবুজ রঙের গাছের পাতা এক অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ তৈরী করে !

আমাদের University of Maryland' এর ক্যাম্পাসের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাঁ করে পাহাড়ের গায়ে রঙের খেলা দেখছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সময়টাকে বলা হয় Fall Season অর্থাৎ গাছের পাতাঝরার কাল। তখন গাছের সবুজ পাতা আস্তে আস্তে হলুদ ও আরো পরে বাদামী হয়ে ঝড়ে পড়ে। কারণ শীত আসন্ন।

আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগের কথা। অক্টোবর ১৯৮৬। মাত্র আড়াই মাস হলো দেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি পি.এইচ.ডি করতে। মাঝে মাঝেই দেশের কথা, ঘরের কথা ভেবে homesick হচ্ছি। তাই যখন জানতে পারলাম আমাদের University-র খুব কাছেই দূর্গাপুজো হচ্ছে তখন আর থাকতে পারলাম না। উদগ্রীব হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম দুই বন্ধুর সাথে। তখন Whatsapp বা Facebook ছিল না। মোবাইল ফোন কি জিনিস তাই জানতাম না। Campus এ বন্ধুদের কাছে কানাঘুসো শুনতাম Stanford University তে ইমেল নামে নাকি একটা জিনিস তৈরী হচ্ছে? তাতে সাথে সাথে খবর আদান-প্রদান করা যায়, অনেকটা টেলিগ্রামের মতো। দেশে বাড়ির খবরাখবর নেওয়ার প্রধান উপায় চিঠি লিখে, Air Mail ছাপ মেরে, ডাক বাক্সে ফেলা। এক চিঠি যেতেই প্রায় দু-তিন সপ্তাহ লেগে যায়।

Baltimore শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চলের প্রায় কয়েক'শ বাঙালীদের সমিতি 'প্রান্তিক'। তারাই এই দূর্গা পুজোর আয়োজক। সবাই যেহেতু ব্যস্ত ও পুজোর অনুষ্ঠানের জায়গা পাওয়াও সহজ নয়, তাই পুজোর মরশুমে এক শনিবার দেখে, একটা গীর্জার বড় হল ঘর ভাড়া করে এই পুজোর আয়োজন হয়।

আমাদের University'র পুরো Campus' এ তখন হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র ভারতীয়। আর বাঙালী তো মাত্র পাঁচজন। পুজোর জায়গায় এসে যেন নিজের বাঙালী সত্ত্বাকে ফিরে পেলাম। একই দিনে ষষ্ঠী থেকে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী হয়ে দশমীর বিজর্সনের পুজো দেখলাম। পরে প্রসাদ হিসেবে খিচুড়ি ও পায়েস সহযোগে দুপুরের খাওয়া হলো।

দেহটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকলেও মনটা বারবার ফিরে যাচ্ছে দেশের পুজোয়। সেই ছোট্টবেলায়। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে শিউলি ফুল তুলে পুজোর মন্ডপে দিয়ে আসা। সারাদিন বন্ধুদের সাথে হটোপুটি করা। অঞ্জলি দেওয়া, প্রসাদ বিতরণ করা। সন্ধ্যায় ধুনুচি নাচের প্রতিযোগিতা। আর রাত বাড়লে ঘুমচোখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা।

চায়ের কাপ হাতে বিকেল বেলা পড়ন্ত রোদে দূর পাহাড়ের গায়ে Fall Season রঙ এর খেলা দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই কখন যেন ফিরে গেলাম শৈশবে। আমার জন্ম আসামে হলেও ছোটোবেলার বেশীর ভাগটা কেটেছে উত্তর বিহারের এক ছোটো মফঃস্বল শহরে, কোশী নদীর ধারে। দশমীর দিন ঠাকুর বিসর্জনের সময় কোশী নদীর ধারে শান্তির জল মাথা পেতে নিতে নিতে নিজের অজান্তেই কখন যে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করত খেয়াল থাকত না।

কেন জানি না এখন হঠাৎ করেই পথের পাঁচালীর অপুর সাথে নিজেকে গুলিয়ে ফেললাম। উপন্যাসের সেই শেষ কালজয়ী প্যারাগ্রাফ'টা যা এখনও মনের গভীরে গেঁথে আছে, সেটা মনে পড়ল। "পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন - মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি, তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙারে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায় ..... তোমাদের সেনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে। ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতী খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে শুধুই সামনে ..... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে,

জানার গন্ডী ছেড়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে ..... দিন রাত্রি পার হয়ে,
জল মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায় .... তোমাদের মর্মর জীবন স্বপ্ন শেওলা ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না ..... চলে, চলে, ... চলে-এগিয়েই চলে.... অনির্বান তার বীনা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ .... সে বিচিত্র পথের আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘর ছাড়া করে এনেছি। ..... চল এগিয়ে যাই।

পথের দেবতার সেই আনন্দ যাত্রার পথের অনেকটা পেরিয়ে এসেছি গত আটত্রিশ বছরে। বাল্টিমোর (Baltimore) শহরে তিন বছর কাটিয়ে গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এখন আমি বাসিন্দা দক্ষিনের রাজ্য লুইজিয়ানার (Louisiana) শহর Lafayette। আমার কর্মভূমি University of Louisiana at Lafayetteএ। গত প্রায় চার দশকে অনেক কিছুই পরিবর্তিত হতে দেখেছি। এখন mobile ফোন এর দৌলতে ও Google মহাশয়ের কল্যানে পৃথিবীর যেকোনো জায়গার দূর্গাপুজো ঘরে বসে দেখতে পাচ্ছি। দেখছি অনেক কিছু। যেমন এখন বিদেশে অনেক জায়গাতেই বাঙালীদের নিজস্ব দূর্গাবাড়ি তৈরী হয়েছে। যেখানে ধূমধাম করে চার দিন ধরে পুজো হয়। আবার দেখেছি বাঙালীদের নিজস্ব খেয়োখেয়ি। একটা পুজো কমিটি ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যাওয়া। কারণ পুজোর খিচুড়ি'তে মটরশুঁটি দেওয়া হবে, কি হবে না? তাই নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত।

কিন্তু প্রবাসে এতোগুলো বছর কাটিয়েও কেন জানি না অক্টোবর মাস এলেই ছোটোবেলার সেই পুজোর কথা মনে পড়ে যায়। ফ্ল্যাশব্যাকে ভেসে ওঠে শিউলি ফুল, ঢাকের শব্দ, ধুনুচির ধোঁয়ার আড়ালে ঠাকুরের জলজ্যান্ত মুখ, অঞ্জলি দেওয়া, প্রসাদ খাওয়া, চোখের জলে মাকে বিদায় দেওয়া। আসছে বছর আবার হবে।

জীবন তার অদৃশ্য যাত্রায় এগিয়েই চলে। কিন্তু শরতের সেই আবেগ আর কোশী নদীর জলে আকাশের শারদীয় রঙ কখনো ফিকে হয় না!

"ফুটি যেন স্মৃতি - জলে,
মানসে, মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে!"
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বিলেতের টুকিটাকি

দিবাকর দেবনাথ। আগরতলা।

না। আমি কোনো দিন স্বপ্ন দেখিনি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার বিলেত আসবো। বিলেত সম্পর্কে তেমন করে জানার কৌতূহলও ছিলো না। ওদের ইলেকশনের সময়ে অথবা বড় কোনো ঘটনা ঘটলে ক'দিন খোঁজ খবর নেওয়া - এই টুকুই। আর যেটা সকলেজানেন, প্রায় দুইশ বছর ভারত শাসন করেছে ব্রিটিশরা। ছেলে চাকরি সূত্রে লন্ডন থাকে। তাই সুযোগ হলো। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে নেমে প্রথমে যে কথাটি মনে হয়েছে, কি এমন আলাদিনের আশ্চার্য প্রদীপ ওদের কাছে ছিলো যে, ভারতবাসীর মাথায় টুপি পরিয়ে দু'শো বছর শাসন করেছে। শুধু ভারত নয়. এক সময় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য ছিলো ব্রিটিশদের। পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ এলাকায় ছিলো তাদের শাসন। সেজন্য বলা হতো বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যেতো না। আজকের বিলেত শত শত বছর ধরে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা ভোগ বিলাস আর সমৃদ্ধির শীর্ষে অবস্থান করছে। এই রকম একটি উন্নত ও উচ্চ বিত্তশালীদের দেশ দেখা ও এনজয় করার ক্ষেত্রে নিজের অবস্থানগত দিকটি মনে রাখা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমার মতো একজন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের, বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের নিম্নবিত্ত পরিবারের সাধারণ মানুষের কাছে যেটা বিস্ময়, কৌতুহল, আকর্ষন এবং অস্বাভাবিক কিংবা অশোভন ও অগ্রহনযোগ্য মনে হবে, সেটা অনেকের কাছে নাও হতে পারে। বিলেতের লন্ডন সিটি থেকে দূরের কোনো গ্রাম -সর্বত্র চোখে পড়বে অসংখ্য প্রাচীন স্থাপনা। একশো, দুইশো বছর, হাজার বছর আগের। প্রতিটি স্থাপনা ও তার ইতিহাস সযতেন সুরক্ষিত। বিলেতে যে বিষয়টি সবচেয় ভালো লেগেছে, তা হলো

শৃঙ্খলা। এখানকার মানুষ আইন সচেতন। সকলেই আইন মেনে চলে। রাস্তায় পুলিশ খুব কম চোখে পড়ে। ট্রাফিক পুলিশ নেই কোথাও। রাস্তা পার হবার সময় নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগন্যাল পোস্টে লাগানো বোর্ডে বোতাম টিপে অপেক্ষা করতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যেই দুই দিকে গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। মাঝরাতে যখন গাড়ি কম থাকে, তখনও দেখেছি লাল বাতি দেখলে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত । প্রতিটি গাড়ী লাইনে চলে। ওভারটেক করার প্রবণতা নেই। রাস্তায় অটো, বাইক, স্কুটি নাই। প্রচুর ইলেকট্রিক সাইকেল। সাইকেলের জন্য নির্দিষ্ট রুট রয়েছে। বাস, ছোট গাড়ি, সাইকেল, ফুটপাত ডাবল লেন। প্রায় সব বাড়িতে গাড়ি আছে। অধিকাংশ বাড়িতে একাধিক গাড়ি। এখানে বাস, রেল, মেট্রো, টেক্সি ভাড়া আকাশ ছোঁয়া। সময় মেনে পাবলিক পরিবহনগুলি চলে। এক মিনিটও দেরি নয়। লন্ডন সিটিতে কয়েকটি রিক্সা চোখে পড়লো। ফুল দিয়ে বেশ সাজানো। সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে। বিত্তবান টুরিস্টরা সখ করে চড়ে। রিক্সায় পা রাখলে আড়াই হাজার টাকা। আমরা আছি লন্ডন সিটি থেকে খানিকটা দূরে ওলভারহামটন সিটিতে। এখানে ছেলে আকাশের অফিস। ওলভারহামটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে ফ্ল্যাট ভাড়া। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর ভারতীয় ছেলে মেয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ভালো লাগার বিষয় হলো, দূষণ নেই। শহর গ্রাম সর্বত্র প্রচুর সবুজ। গাড়ির ধোঁয়া নেই। হর্নের আওয়াজ খুব একটা শোনা যায় না। পথঘাট একেবারে ঝকঝকে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট পরিকল্পিত ভাবে নির্মিত। উঁচু আওয়াজে কেউ কথা বলে না। পাশের ঘরে শব্দ যায় না। রাস্তায় মিছিল মিটিং নেই বললেই চলে। নেতা মন্ত্রীদের কৃত্রিম হাসি মুখের পোস্টার ফ্যাক্স কোথাও নেই।

একদিন লন্ডন সিটির একটি মোড়ে দেখলাম কিছু ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে প্যালেস্টাইন ইস্যুতে শ্লোগান দিচ্ছে। তাদের পাশেই আর জি কর ইস্যুতে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে কিছু ভারতীয় ছাত্র ছাত্রী। সপিং মল, সপিং কমপ্লেক্স নির্দিষ্ট জায়গায়। যেখানে সেখানে দোকানপাট নেই। সপিং কমপ্লেক্সে সব পাওয়া যায়। বিশেষ করে ভারতীয় পন্যসামগ্রী। মাছ, মাংশ, সব্জি সব প্যাকেটজাত। বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার বাংলাদেশ থেকে আসা সব মাছ পাওয়া যায়। শুটকিও পাওয়া যায়। বাঙালী হোটেল রেস্টুরেন্ট রয়েছে। মন্দির আছে অনেক। বেশি গুরুদোয়ারা। শিখ ধর্মাবলম্বীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেশি। ওলভারহামটনে আকাশের ফ্ল্যাটের অদূরে একটি কৃষ্ণ মন্দির রয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমরা সেখানে যাই। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এখানে অন্নভোগ খাওয়ানো হয়। একেবারে ভারতের মন্দিরের মতো। অন্ন, একাধিক সব্জি, ডাল, ভাজা, পনীর, চাটনি, পায়েস, ফল, মিষ্টি, জিলিপি ইত্যাদি। প্রচুর হিন্দু সমাবেশ হয়। সবাই নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন। আকাশ প্রায়ই মঙ্গলবার যায়। সপ্তাহে একবার তো দেশীয় খাবার পাওয়া যায়।

ইংল্যান্ডে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ দুইই আছে। এছাড়াও সারা পৃথিবীর তিন শতাধিক ভাষাভাষী মানুষ স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। লন্ডন সিটিতে সমগ্র বিশ্বের অতি উচ্চ বিত্তশালীদের বসবাস। এখনকার মানুষ ছুটির দিনগুলি খুব এনজয় করে। শনি রবি ছুটির দিন। শুক্রবার বিকেল থেকেই শুরু হয়ে যায় 'পার্টি'। প্রতিটি শহরে অসংখ্য পাব, বার, নাইট ক্লাব, মদের দোকান। পার্ক, থিয়েটার, জু, মিউজিয়াম, খেলার মাঠ, টুরিস্ট স্পষ্টগুলিতে পারিবারিক ভীড়। কোথাও উশৃঙ্খলতা নেই। ছুটির দিনে রাস্তায় বের হলে দেখা যায়, উচ্চ বিত্তশালীরা জীবন কতটা উপভোগ করছে। তবে অপরাধ মুক্ত নয় ইউ কে। নেশাসক্তদের উৎপাত এখানেও আছে। খুব বেশি মোবাইল ছিনতাই হয়। আকাশ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলো, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কথা না বলতে। আমরা ভারতবাসীরা 'কোহিনুর' নিয়ে অনেক চর্চা করি। আমাদের কোহিনুর বিলেতের যাদুঘরে 'বন্দী'। কিন্তু লন্ডন মিউজিয়াম দেখে মনে হলো ওরা শুধু একটি কোহিনুর বা টিপুর সুলতানের তলোয়ার নিয়ে আসে নি। ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস ইত্যাদি যা কিছু পছন্দ হয়েছে সব উজার করে এনে সমৃদ্ধ করেছে ওদের মিউজিয়াম।

‘এন ইভিনিং ইন প্যারিস...’

সরযূ চক্রবর্তী। আগরতলা।

‘ইভিনিং ইন প্যারিস’- মানেই এক মায়াবী দুনিয়া। আর এর সাথে আইফেল টাওয়ার জুড়ে গিয়ে হয়ে ওঠে ‘স্বপ্নে দেখা শহর’। যার দুর্নিবার আকর্ষণ আজও গোটা বিশ্বকে চুম্বকের মত টেনে রেখেছে! এর মায়াবি অনুভূতি মনের স্মৃতিকোঠায় অমলিন রয়ে যাবে।

শতবর্ষের ব্যবধানে ইউরোপের যে শহরে অলিম্পিকের আসর বসেছে, সেই প্যারিসে সামিল হবেনা আইফেল টাওয়ার? তাও কি হয়! আইফেল সাহেবের এই টাওয়ারকে ঘিরেই ছিল প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন। এখানে ছিল বিচ ভলিবল, কুস্তি আর জুডোর লড়াই। সবই ছিল অস্থায়ী ধাঁচা’তে। রথ দেখা, কলা বেচা- র মতো ছিল এই খেলা ও আইফেল টাওয়ার দেখার যুগ্মউন্মাদনা! পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবতেই টাওয়ার হয়ে উঠে মায়বি। লেসার আলোর বিচ্ছুরণ এবং বাহারি রং-এর খেলা দেখার জন্য বহুদূর থেকে অপলক দৃষ্টি সরানো অসম্ভব।

টাওয়ার চত্বরে ছুটির দিনে ভীড় অস্বাভাবিক। লম্বা লাইন ছাড়া সেখানে পৌঁছানোর কোন বিকল্প নেই। গলি পথ ধরে টাওয়ারের কাছে পৌঁছলে সেখানে নিরাপত্তার নিয়ম মাফিক প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। সেই ধাপের পর শুধুই সাজানো এলাকা। বাহারি ফুলের সমাহার আর সবুজ ঘাসের লন। সামান্য এগিয়ে গেলেই ‘লা ডামে ডে ফের’। এই তো ফরাসি নাম ১৮৮৭ সালে নির্মাণ শুরু হওয়া এই টাওয়ারের। যার ইংরেজি তর্জমা ‘আয়রন লেডি’। বাস্তুকার গুস্তাভো আইফেল সাহেব ১৮৮৯ সালে নির্মাণ শেষ করলেও প্রথম দুটো অলিম্পিকের আয়োজনে প্যারিসে সেভাবে আলোকিত করা যায়নি এই টাওয়ারকে। যতটা এবার তুলে ধরা হয়েছে ১৩৫ বছরের ফরাসি অহংকার’কে।

১৯৯১ সালে ইউনেস্কোর ওয়াল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত এই টাওয়ার। কেন, সেটা কাছে না গেলে সত্যিই বোঝা মুশকিল। টাওয়ারের একবারে নীচে দাঁড়িয়ে একবার ভাবতেই হবে, এতো বছর আগে সেরকম কোন অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ছাড়া কি ম্যাকানিজমে মাত্র দু’বছরে মাথা তুলে দাঁড়ালো এই টাওয়ার! গুস্তাভে ও তাঁর টিম কিভাবে সাহস করলেন এই কীর্তি গড়তে। যার আর্কিটেক্ট স্টিফেন সোভেস্ট্রে, এমিলি নোওগুয়েরো এবং মাউরিসে কোয়েচলিন। আইফেল কোম্পানির এই স্থাপনার মূল বাস্তুকার গুস্তাভে, এমিলি ও মাউরিসে। ৩৩০ মিটার (১০৮৩ ফুট) উঁচু এই টাওয়ারটি দাঁড়িয়ে আছে প্যারিসের ‘চাম তে মার্স’ এলাকার গ্রীণ হাত-এ।

আইফেল টাওয়ারকে ছাড়িয়ে পরবর্তি সময়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বহু টাওয়ার। যার মধ্যে এই সময়ের সব থেকে উঁচু টোকিও স্কাই ট্রি (৬৩৪ মিটার), ক্রিস্টাল বিল্ডিং, টোকিও টাওয়ার, কিয়েভ টিভি টাওয়ার আরো রয়েছে। কিন্তু গুস্তাভে সাহেব রাউট আয়রন-এ অসাধারণ নক্সা তৈরী করে যে টাওয়ার তুলে ধরেছেন তা আজও অতুলনীয়। পশ্চিম আকাশের লাল আভায় মেঘের খেলার মধ্য দিয়ে ডুবে চলা আলোর সাথে, আইফেল টাওয়ারের আলো জ্বলে উঠার সন্ধিক্ষণে, সেইন নদীর সেতু ধরে এগিয়ে চলা সকলকেই একটি বারের জন্য বলে - দাঁড়াও পথিকবর তিষ্ঠ ক্ষণকাল...।

শুধু আইফেল নয়, গোটা প্যারিস শহরটাই ‘ইভিনিং’-এ মায়াবী রূপ ধারণ করে। এখানে ইভিনিং ঘড়ির কাটায় রাত ৯টার পর! হিসেব তাই বলে। গরমে সেটা রাত ১০টায়। এরপর সন্ধ্যা পেরিয়ে, রাত গভীর হয় আরও পরে। আলোর বর্ণচ্ছটায় রাতের প্যারিস অপরূপ। পাব, রেস্তোরাঁয় বিকেল থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয় সন্ধ্যা ও রাতকে স্বাগত জানাতে। সেটা আইফল চত্বর বা মধ্যশহর সব জায়গাতে একই চিত্র। এটাই প্যারিস- মায়াবী দুনিয়ার স্বপ্নপুরী।

মনে পড়ে সেই সব দিন

অজয় ভট্টাচার্য। উদয়পুর।

কথায় বলে "স্মৃতি সততই সুখের"। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, মানব জীবন হলো সুখ, দুঃখ, রাগ, অনুরাগের এক জটিল মিশ্রণ। তাই কিছু স্মৃতি যেমন আমাদের হাসায় বা ভাবায় আবার তেমনি কিছু স্মৃতি আমাদের কাঁদায়ও। আমি লেখক নই। গান-বাজনার জগতের লোক। তবে শিল্পীও নই। আমি নিজেকে একজন নিছক Music Lover বলে ভাবি!

একজন Music Lover হিসেবে এরাজ্যের তথা আমার শহরের সাংস্কৃতিক জগতটাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং উপভোগ করেছি। তাই গান-বাজনার সেকাল একালের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে আমাকে একথা বলতেই হবে যে, সেকালের গান-বাজানার জগতে বহু দ্বন্দ্ব বা মতভেদ থাকলেও শিল্পীদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৌজন্য বোধ ছিলো। ছিলো সুস্থ-সুন্দর পেশাগত প্রতিযোগিতা। আজ তা সেরকমভাবে চোখে পড়ে না। পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি চর্চার প্ল্যাটফর্ম গুলোও পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায়, হাল আমলে সংস্কৃতি জগতে ব্যক্তি বিশেষের অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করা এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রযুক্তি বিদ্যা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় পরিপূর্ণ একটা অসম প্রতিযোগিতার জন্ম হয়েছে। বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সেজন্য আমি অবশ্যই বলবো, 'Old is Gold'! উদয়পুর আমার জন্মভূমি। এ শহরেএমন বেশ কয়েকজন গুণী ব্যক্তিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি যাঁরা শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন বা আত্মপ্রচার করাটাকেই জীবনের মূলমন্ত্র বলে ভাবতেন না। তাঁরা এই শহরবাসীদের মুক্তহস্তে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন বা দিয়েছেন। তাঁদের নিজেদের লাভলোকসানের কথা তাঁরা কখনো ভাবতেন না। আমার ব্যক্তিগত ভাললাগা ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে ছোট্ট পরিসরে শুধুমাত্র তাঁদের কথাই বলবো।

আসলাম জেঠু। যাঁর পোশাকী নাম ছিলো জিতেন্দ্র দেববর্মা। তবে এনামে কেউই তাঁকে চিনতো না। আসলাম দা নামেই তিনি সবার কাছে পরিচিত। পেশায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। সৌখিন সেতার শিল্পী। বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হবার আগে অবধি রোজ ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা অব্দি 'রিয়াজ' করতেন। খুবই পরিচ্ছন্ন ও সুরেলা হাত ছিলো। এই শহরে সেতার চর্চার ক্ষেত্রে প্রয়াত আসলামজেঠুর বিশাল অবদান রয়েছে। তাঁর বাড়িতে ছোটখাটো একটা ব্যায়ামাগারও ছিলো। তৎকালীন উঠতি যুবকেরা সেখানে গিয়ে বিনে পয়সায় শরীরচর্চা করতেন।

এবার বলি প্রয়াত তিন সঙ্গীত গুরু যথাক্রমে প্রদ্যোৎ নারায়ণ মজুমদার (বাদল), ঊষা রঞ্জন দাস ও বিনয় ভূষণ দেবের কথা। সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে তাঁদের বিশাল অবদান রয়েছে। আজ যাঁরা এই শহরে গান গাইছেন বা শেখাচ্ছেন, সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁদেরই ছাত্র-ছাত্রী। তাই সংস্কৃতি প্রেমী উদয়পুরবাসী হিসেবে তাঁদের কাছে আমরা অবশ্যই ঋণী। বাদলজেঠু কণ্ঠ সংগীতের পাশাপাশি সেতারও বাজাতেন। বেশ কয়েকজন ছাত্র তাঁর কাছে সেতার শিখতো। আমি সেকথা জানি কারন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তবলা বাদকের দায়িত্বটা আমাকেই পালন করতে হতো। তাঁকে হাওয়াইয়ান গিটার বাজাতেও আমি দেখেছি।

উষারঞ্জন জেঠু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল হয়ে চলে এসেছিলেন ত্রিপুরায়। কাঁকড়াবন বেসিক ট্রেনিং কলেজে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমার বাবা প্রয়াত অনাদি চরণ ভট্টাচার্য ও বীরু কাকুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। উষা জেঠুর কণ্ঠে শ্যামাসংগীত শুনে তাঁরা মুগ্ধ হন। তাঁদের ডাকে তিনি উদয়পুর চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। কালক্রমে উষারঞ্জন দাস একজন সুগায়ক ও সংগীত শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। টাউন হলে, উদয়পুর সঙ্গীত চক্র আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় (১০/০৯/২০০১) তাঁর ভাষনে তিনি সেকথা বলে গেছেন।

প্রয়াত সঙ্গীত গুরু বিনয় ভূষণ দেব এশহর ও তার বাইরে বহু ছাত্রছাত্রী তিনি তৈরি করে গেছেন। তিনি বলতেন তানসেন নয়, কানসেন তৈরি করাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। তাঁর সান্নিধ্যে এসে ধীরে ধীরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আমার গভীর

. ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জন্মায়। তাই আমি বলবো, এই অধমও তাঁরই তৈরি করা একজন কানসেন। নবীন প্রতিভার উন্মেষের ক্ষেত্রেও তিনি আজীবন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন।

বিগত শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে বিশালগড় নিবাসী শ্রী জহর ভৌমিকের হাত ধরেই এশহরে হাওয়াইয়ান গিটারের চর্চা শুরু হয়। পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক হলেও গিটার শিক্ষাগুরু হিসেবেই তিনি বিশাল পরিচিতি লাভ করেছিলেন। অন্যকোনো Musical Instrument শেখার সুযোগ তখন এখানে ছিলো না।

তারপর কেটে গেছে কতকাল। গোমতী ও বিজয় নদ দিয়ে গড়িয়েছে বহু জল। আজ আমরা প্রত্যেকেই নতুন মিলেনিয়ামের এক একজন অতি আধুনিক চিন্তা-ভাবনা সম্পন্ন নাগরিক। হয়তো কালের নিয়মেই আমাদের বাড়ি থেকে ওই হাওয়াইয়ান গিটারগুলো আজ উধাও হয়ে গেছে। এসেছে স্প্যানিশ গিটার, এসেছে সিন্থেসাইজার। এসেছে Geoshred। তাই 'জহর স্যার'কেও এখন আর দেখা যায় না। বর্তমানে এখানে বহু ছেলেমেয়েই স্প্যানিশ গিটার বাজায়। কিন্তু সৃজনশীল সংস্কৃতির আঙিনায় তাদের উপস্থিতির হার শূন্যের কোঠায়! বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

এশহরে রাবীন্দ্রিক ভাবধারার প্রচার ও প্রসারে প্রয়াত শিক্ষক, শিল্পী নবদ্বীপ চন্দ্র দাসের কথা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তেমনিভাবে তবলা চর্চাকে আরো জনপ্রিয় করতে প্রয়াত মিহির লাল গোস্বামী, শ্রী প্রিয়লাল লস্কর, শ্রী রজত ভট্টাচার্যের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। কারন ওঁদের আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন সুখস্মৃতি আজও অমলিন হয়ে রয়েছে।

সাহিত্য চর্চা প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমার বাবা প্রয়াত সাহিত্যিক, ভাষাবিদ অনাদি ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্তের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় উদয়পুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় দু'দিনব্যাপী (১০-১১ নভেম্বর, ১৯৯০ইং) অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক সাহিত্য সম্মেলন। তাতে সর্বসাধারণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। প্রয়াত সাহিত্যিক অনাদি ভট্টাচার্য যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আত্মকেন্দ্রিকতা ও মতাদর্শের উর্দ্ধে উঠে সাহিত্য চর্চা করেছেন। এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য কথা। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য কেউ এগিয়ে এলেন না। এটা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার বলে মনে হয়। সুলেখক শ্রী সুশীল দে কে আজ উদয়পুর ভুলে গেছে? সংসার ত্যাগী সন্নাসী হয়ে তিনি তাঁর শানিত কলম চালু রেখেছেন কিনা জানি না। কিন্তু তাঁকে আমি আজও ভুলতে পারিনা। শৈশবে রমেশ বিচিত্রায় মঞ্চস্থ হওয়া নাটক "ডাইনোসরাস" ও "মহাকাব্য" আজও আমার মনের গভীরে দোলা দেয়।

ছবি ঃ অজয় ভট্টাচার্যের সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

১৯৯৯সাল। সেসময় উদয়পুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত নিত্যগোপাল শূর। যিনি এন.জি. শূর নামেই সবার কাছে পরিচিত। অত্যন্ত মেজাজী, কিন্তু খুবই কর্মঠ, শিল্প, সংস্কৃতি অনুরাগী একজন মানুষ। তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শহরের প্রাচীনতম বইয়ের দোকান বাণীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হীরালাল দাস। দুই বন্ধুর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল 'উদয়পুর বইমেলা' ৯৯' (১০-১৬ মার্চ)। বাকীটা শুধু ইতিহাস। শুধু উদয়পুর নয়, গোটা রাজ্যের ইতিহাসে সেই সাত দিন চির স্মরনীয় হয়ে থাকবে।

উদয়পুর টাউন হলে (জামতলা) বহু বরণীয় শিল্পীর স্মরণীয় অনুষ্ঠান হয়েছে। অতীতে ভিনরাজ্য থেকে কোনো বিশিষ্ট শিল্পী আগরতলায় এলে রাজধানীতে তাঁর অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবার পর, উদয়পুরেও তাঁর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সেই শৈশবকাল থেকে এমনই একটা অলিখিত নিয়ম দেখে এসেছি। আজকাল তেমনটা আর হতে দেখিনা। ওই অলিখিত নিয়ম কেন ভঙ্গ করা হলো তা আমার অজ্ঞাত?

অতীতের গৌরাবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে আবার সজীব করতে হলে অবশ্যই প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও গঠনমূলক চিন্তা ভাবনা। সেই জন্য চাই সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা। তাহলেই সেই উজ্জ্বল দিনগুলো আবার ফিরে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাপ!

সীপা দাস। আগরতলা।

সুমেধা কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছে না। সুস্থ সবল, প্রাণচঞ্চল আটান্ন বছরের পলাশের সুগার, প্রেশার, থাইরয়েড কিছুই নেই। অফিস আর পরিবার নিয়েই আদ্যোপান্ত সুখী এক পুরুষ মানুষ পলাশ। কিন্তু গত তিন চার মাস যাবত লোকটা কেন জানি পাল্টে গেছে বা যাচ্ছে।

দু-তিন জন ডাক্তার দেখানো হয়েছে, সবাই বলছে আপনি একদম সুস্থ। দু-একটা ওষুধ দিয়ে বলছেন, আনন্দে থাকুন, খুশী থাকুন।

এই খুশীটাই তো হারিয়ে গেছে পলাশের জীবন থেকে। মেয়ে-জামাই ফোন করলে, আগে কথাই শেষ হতো না। মেয়ে বিরক্ত হয়ে যেত কখনো কখনো। আর এখন হাঁ হুঁ ঠিক আছে, চলছে, বলেই ফোন রেখে দেয়।

সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার পলাশকে আগে বছরে দুই তিন বার অফিসের কাজে দিল্লি যেতে হতো। প্রতিবারেই সুমেধা সঙ্গী হতো। কাজ শেষে এক দু'দিন একটু ঘুরে বেরিয়ে ঘরে ফেরা।

কাজের জায়গায় পলাশ অত্যন্ত মনোযোগী এবং দপ্তরেও সবাই জানে, পলাশ কতটা কাজ পাগল এবং সিরিয়াস। কিন্তু আজকাল সময়ে অফিস যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু খুব বিরক্ত হয়, কথায় কথায় রাগ করে, চিৎকার করে।

সুমেধা খুব চিন্তায় আছে। কারোর সঙ্গে এসব কথা শেয়ারও করতে পারছে না। গত চার মাস আগে একবার পলাশ দিল্লি গিয়েছিল চারদিনের জন্য এবং তখন সুমেধাকে নিয়ে যায় নি কারণ সে সময় মেয়ে এসেছিল পুনে থেকে।

এরমধ্যেই একদিন অফিসে পলাশ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ম্যাসিভ হার্ট এ্যাটাক। আটচল্লিশ ঘন্টার আগেই সব শেষ।

সুমেধা, পলাশের অফিসের কাজগুলি গোছানোর জন্য কয়েকদিন অফিসে গেছে। এর মধ্যে একদিন একজন পিয়ন এসে পলাশের দুটো ডায়েরী ও টেবিলের কয়েকটা প্ল্যান্ট, ওর কিছু বই আর দুটো পার্সোনাল ফাইল দিয়ে গেছে।

বই পড়ার খুব শখ ছিল কিন্তু কাজের চাপে আজকাল পড়তে পারত না তাই কয়েকটা বই অফিসে নিয়ে রেখেছিল। বলত, সু অন্তত দশ মিনিট কিছু না কিছু পড়ার চেষ্টা করবে। এতে মন সতেজ হয়। এভাবে সুমেধার মধ্যেও পড়ার নেশা তৈরী হয়েছে। সবই এখন অতীত। সুমেধা বেশী ভাবতে চায় না। কষ্ট হয়, খুব কষ্ট। স্বামীকে ছাড়া বড্ড একা হয়ে গেছে সুমেধা।

পলাশের অফিসের দুটো টেবিল প্লান্ট বসার ঘরে সাজিয়ে রেখেছে। বড়ই যত্নে লালন করছে গাছ দুটিকে। অফিসের ফাইল আর ডায়েরী গুছিয়ে রাখবে বলে আলমারি খুলে ভিতরের লকারে ফাইল রাখতে যাবে, কি যেন একটা কাগজ নীচে পড়ে যায়। হাতে নিয়ে দেখে দিল্লি থেকে পাটায়া যাওয়ার টিকিটের জেরক্স কপি। চারজনের নাম আর পলাশ দত্তের নামও আছে। সুমেধা খাটে বসে পড়ে। সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়। মাথাটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেছে। বসে থাকে কিছুক্ষণ। জল খায়। নিজেকে সামলে নিয়ে পলাশের ডায়েরীটা খুলে। প্রতি পাতায় ডেট অনুযায়ী মিটিং আর অফিসের সব লেখাজোখা। পাতা উল্টাতে উল্টাতে একদম শেষের দিকে পলাশ লিখেছে —

সু কে না জানিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পাটায়া আর ব্যাংকক যাওয়া ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। আমি এ কি করলাম। তিন রাতের প্রতি রাতেই আমি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি ওয়াকিং স্ট্রীটের ঐ ঝাঁ চকচকে রেস্টুরেন্টে। যার ভিতরে চলে মদ, মাংস আর মেয়ে শরীরের খেলা। উন্মুক্ত যৌনতা যেখানে উপভোগ্য। পকেটের টাকা উড়িয়ে আমিও হয়ে গেলাম এক বিকৃত মনস্ক পুরুষ। ভালো লাগছিল সবকিছু। কেমন জানি ঐ নীল ছবিতে দেখা মোহময়ী নারীরা চোখের সামনে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

বন্ধুরা বুঝিয়েছিল, নিত্য দিনের ধরাবাঁধা জীবনের বাইরে এক অদ্ভুত জীবন। চল, আমাদের সঙ্গে। বৌদি টেরও পাবে না। আরও আশ্চর্য হলাম, যখন দেখলাম চারজনের জন্য চারটি মেয়ে আমাদের সঙ্গী হলো। ডাবল বেডরুমে আমি আর একটি থাই মেয়ে একাকী। সব ভুলে মদের নেশায় আমি মেয়েটির যৌবন উপভোগ করলাম। চারদিন এমন সব কিছু করেছি, সেগুলো ছিল পাপ, মহাপাপ। থাই মেয়েদের নেশা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

সু ভাবল, আমি দিল্লি থেকে মিটিং সেরে ফিরেছি। কিন্তু সু এর চোখে চোখ মেলাবার সাহস আমার ছিল না। মন উথাল পাতাল। আমি সু কে এমন ভাবে ঠকিয়েছি ভাবতেই আমার সারা শরীরে বিশ্রী রকমের হালচাল শুরু হয়। রাতে সু কে না ধরে ঘুমালে আমার ঘুম আসত না। এখন আমি সু-এর শরীরের কাছেই যেতে পারছি না। মনে হচ্ছে এই পাপী হাত দিয়ে আমি ঐ নোংরা মেয়েদের শরীর ছুঁয়েছি। এই হাতে আমি সু কে ছুঁতে পারব না। রাতে ঘুম আসে না। সারারাত জেগে থাকি। শরীরে অস্বস্তি হয়। সু কে ঠকানোর দায় আমার। আমি জানি, আমি কতটা পবিত্র। নিজের স্ত্রী ছাড়া কোনোদিন কোনো নারীকে মনে মনেও কল্পনা করিনি। সেই আমি কিনা এই বয়সে এসে এমন নোংরা কাজ করলাম....

পড়তে পড়তে সুমেধার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল নয়, আগুন বেরোচ্ছিল। ফাইল, ডায়েরী, কাগজপত্র সব নিয়ে ছাদে গেল। দেশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেখছিল কিভাবে পাপ পুড়ছিল। পুড়ছিল পলাশের কৃতকর্ম। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারটা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে জলের নীচে। ধুয়ে যাচ্ছে পলাশের প্রতি সুমেধার প্রেম, ভালোবাসা, নির্ভরতা সবকিছু স...বকিছু।

Dipankar Sur

Mobile : 9856661016/8119057150
E-mail : dipankarsur12@gmail.com

Associate with

N R UDYOG

Digital Printing Service
Neru Super Market, Room No. 10 & 26

Tumble Dry

Dry Clean Service
Opp. Udaipur Girls' H.S School

Kohinoor - Tour & Travel & Common Service Centre

West Bank of Mahadev Dighi (Sitlabari Road)
Udaipur, Gomati, Tripura

Service to :

* Flex Printing
* Offset Printing
* Photo Printing
* DTP & Silk Screen Printing
* Marriage & Invitation Card
* Trophy-Memento-Certificates
* Printing & Office Materials
* Dry Clean Service
* Tour & Travels (Domestic & International)
* Air & Railway Ticket
* Digital Service : DSC-Aadhar-PAN-Passport Visa-School & College Admission Form - Job Form Fill up etc.

১০৯ নম্বর যাত্রী

বিল্লাল হোসেন। বিশালগড়।

—**বা**বা বট বৃক্ষ। আমি তোমার ডালে ঝুলে এই পচন-পৃথিবী থেকে পালাতে চাই। তুমিতো 'বোধি'। আমায় নাও তবে!

—এভাবে যাসনে। এখানে একবারই আসে মানুষ বুঝলি! একটু মানিয়ে থাক। যে কটা দিন ঈশ্বর তোকে.....।

—না, ওই ভদ্রলোকের কথা আমাকে আর বলোনা। বরং আমাকে তুমিই সঁপে নাও। বটবৃক্ষ গম্ভীর লয়ে, দাঁত বের করে হাসে, "একরোখা! যাবারজন্য পাগল-পাগল করছিস কেবল। তবু শেষবারের মতো বলছি, "ভেবে দেখ"।

— বহুবার ভেবেছি। আমার বিষয়টা ঠিক ওইরকম না বাবা। আমি পরাজিত, লজ্জিত এবং লুণ্ঠিত। পালাতে চাই। শিগ্‌গির পালাতে হবে। এখানে বেঁচে থাকার আর উপায় নেই।

— বৃক্ষ বায়বীয় উচ্ছ্বাস বিস্তার করে — 'শুওওওও, হাআআ, হাআআহিশশশ। "তুমুল বাতাসে ভয়ঙ্কর আলোড়ন শুরু হয় অরণ্যে। গম্ভীর গলায় আহ্বান ছড়িয়ে দেয় —

—আয় তবে। বুকে আয়।

বৃক্ষ হাত নেড়ে, মাথা দুলিয়ে, বুক দেখিয়ে, পিঠ দেখিয়ে, মায়া ছড়িয়ে ব্যাকুল হয়ে ডাকে।

মন ভরে যায় শিমূল পাত্রের। মৃত্যুর জন্য জায়গাটা মন্দ নয়। বাড়িথেকে অনেকটাই দূরে। পাঁচশো মিটার দীর্ঘ রাবার উদ্যান। এরপর পশ্চিম দিকে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মোড় নিয়েছে মাটির পথ। জাম বাগানটা পেরিয়ে জনমানবহীন অরণ্য। নির্জন এবং নিরাপদ। সবুজ ঘাসে ভরা একচিলতে উপত্যকা। এর বাদিকে টিলায় ঢুকে গোল-গোল পাতার এক বট বৃক্ষ। বয়সে যেন পিতামহ। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। নিচে বিস্তৃত ছোটো-ছোটো বুনো ফুলের গাছ। সাদা ফুলের সমাহার। এখানে আকাশ বহুদূর বিস্তৃত। শিমূল তার ভেতরের শিমূলকে সামনে বসায়। একজন শিমূল হয়ে যায় দুইজন। দুই শিমূল সামনে বসে ভাব বিনিময় করে নির্জন অরণ্যে।

—এখানে মরতে পারলে দারুণ হবে! কি বলিস শিমূল।

— একদম তাই। মৃত্যুতো ধূপকাঠির মতো পবিত্র। এরজন্য একটি পরিবেশ নির্বাচন করাই যথার্থ।

—আচ্ছা মৃত্যু নিয়ে কী কী গান আছে? গলা ছেড়ে তেমন একটা গাইতে পারলে বুক ভরে যেতো। তাইনা।

—সত্যিই। চল দুজনে মিলে খুঁজি।

হৃদয় এবং মস্তিষ্ক দুজনের মিলে খুঁজতে শুরু করে। মস্তিষ্ক খোঁজে মস্তিষ্কের ভাঁজে-ভাঁজে, হৃদয় খোঁজে রক্ত কণিকায়। তেমন একটা গান চাই। কিন্তু পছন্দমত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা এই মুহূর্তে। যা মাথায় আসছে সবই প্রেমের গান। প্রেম ইকুয়েল টু মৃত্যু কিম্বা মৃত্যু ইকুয়েল টু প্রেম। অদ্ভুত সব সমীকরণ এবং রসায়ন। হৃদয়ের ভূগোল কেমন অর্থহীন প্রান্ত বদল করে। গানও গায় মানুষ!

— পৃথিবীর জন্য 'প্রেম' একটা ফালতু শব্দ, তাইনারে শিমূল?

—হুম। এটা 'মায়া' ছাড়া আর কিছুনা। 'প্রেম' মানুষের চোখে কালো কাপড় বেঁধে কলুরবলদের মতো নির্মম ভাবে ঘানিতে ঘোরায়। জীনবভর এই চড়কিঘূর্ণন শেষ হয়না। একই বৃত্তে ঘুরতে -ঘুরতে অসম্পূর্ণ জীবন নিয়ে সম্পূর্ণের দিকে যেতে হয়। 'প্রেম' মানুষকে দাস বানায়। এই দাসত্বমুক্তিই কি জীবনের মোক্ষ?

—জানিনারে! তবে এই 'প্রেম' পরাজিত করে আমি বৃক্ষের ডালে পালাব। জীবনের মোক্ষ লাভ।

গাছের পিঠে ক্রস এঁকে বাড়ি ফিরে শিমূল। হাবিজাবি ভাবতে-ভাবতে বহুদিন বাদে তার স্ত্রীকে আজ একান্তে পেতে ইচ্ছে করে। মনের এই স্বাদ স্ত্রীকে বুঝতে দেয়না। শিমূল ঠিক করে, সংসারে তৈরি মনের সেতুগুলি শিগ্‌গির ভেঙে দেবে। সেতু না থাকলে ঝাড়া হাত-পা।

—'প্রেম' আর 'সেতু' বুঝি সমার্থক! দুটো জুড়ে দেয়, গড়ে দেয় যে। 'ফাঁদ' আর 'প্রত্যাশা' তৈরি করে। মানুষকে কলুর বলদে পরিণত করে। জীবনে এই প্রথম 'প্রেম' আর 'সেতু' এই শব্দ দুটি একসঙ্গে গলাগলি করে তার মস্তিষ্কে এসে ধরা দেয়। মুহূর্তেই বদলে দিয়েছে তার সমগ্র জীবনের বোধ।

এসব জটিল আর বৃত্ত-ভাবনায় বিধ্বস্ত হতে-হতে স্ত্রীকে ডাকে শিমূল,

'পারমিতা, আদা দিয়ে চা খাব'। শুকনো মুখে পারমিতা জানায় 'চিনি নেই'।

চিনি ছাড়াই দাও। একটু লবণ দিও।

ছলছল চোখ পারমিতার, 'তুমি চিনি ছাড়া চা খেতে পারনা গো!'

কর্কশ গলায় জাবাব দেয় শিমূল, 'এসব বলে-ভেবে লাভের লাভ কিছু হবে? ন্যাকামি যত সব!'

'চাকরিটা কি হবে গো আবার?'

'আমি সরকার নাকি! তোমার এতো কিছু জানার কি দরকার?

পারমিতা চোখ মুছে। ধমক, তর্জন-গর্জনে রাগ তার হয়না। নিজেকে শান্ত্বনা দেয়, 'মানুষটা আগেতো এমন ছিলোনা। যে মানুষটা দুহাতে টাকা খরচ করতো। দায়িত্ব পালনে কসুর করতনা। সে তো আজ চাকরিহারা। পকেটে টাকা নেই। একটু রাগারাগি করে আরকি। তা করুক'। শিমূল আকাশের দিকে চেয়ে, বারান্দায় উদাস হয়ে বসে থাকে।

একটা মাছরাঙা বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে, আড়াআড়িভাবে উত্তরদিকে উড়ে যায়। কয়েকটা চড়াইপাখি আমড়া গাছটার ডালে বসে কিচিরমিচির করে। কচি লালরঙের বাছুরটা সাদা উঠোনে নেচে সারা হয়। স্কুল থেকে ফিরে সরলরেখায় দাদুর ঘরে চলে যায় পাপ্পু। শিমূল তার পেছনদিকে দৃষ্টি বিস্তার করে আপাদমস্তক খতিয়ে দেখে।

— লকলক করে বেড় যাচ্ছে গো ছেলেটা। আগে বাবার খুব কাছাকাছি থাকতো। এখন খানিকটা দূরত্ব বাড়িয়ে নিয়েছে। সে কি মনে মনে টের পেয়ে গেছে, আমি পালাবার ফন্দি করছি! তাই আগে থেকেই দূর করে দিচ্ছে আমাকে! কি জানি তার মনের খবর বোঝা মুশকিল। ছেলেটাকে কেমন রহস্যময় লাগে।

ভেতরের শিমূলটা তাড়া দেয়, 'এসব আজেবাজে ভাবনা রাখ তো!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিমূল। টাকা খরচা করতে পারলে এই দুঃসময়, দুঃশাসনের দেশেও একদিন দাঁড়াতে পারত ছেলেটা। ট্যালেন্ট রয়েছে। গৃহশিক্ষকের জন্য মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করছে পরশুদিন রাতে। শিমূল টের পায়না তা নয়। তবু না বোঝার ভান করে। বুঝে না বুঝে কয়েকটা দিন পার করতে পারলেই হয়। পাপ্পুর এই এড়িয়ে চলা তবু শিমূলকে কষ্ট দেয়। শিমূল তখন ভেতরের শিমূলটাকে সামনে নিয়ে বসে। শিমূল এবং শিমূল মুখোমুখি

— পাপ্পু আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে কেন?

— করুক। তাতে অসুবিধা কি? যতখুশি এড়িয়ে চলুক। তোর কি? বরং খানিকটা সুবিধা। হাঁটতে, বসতে এটা-সেটা বায়না, আবদারের সুযোগ পাবেনা।

— কাজটা তাহলে খারাপ হয়নি রে শিমূল।

— এক্কেবারেই না।

— এমনিতেই পকেট ফাঁকা। তার ওপর চাপ বাড়াটা বিপদ ছাড়া আর কিছুনা। চাপ যতই কমিয়ে রাখা যায় ততই ভালো। মাথাটা ঠিক থাকে।

— হু, বরং এভাবেই থাক। দূরে, দূরে, আরও দূরে চলে যাক। আর সুযোগ পেলে হুট করে তো আমিই পালাচ্ছি।

— মৃত্যুর জন্য গাছটা দারুণ হবে নিশ্চই, তাইনা! মোটা খয়রিবর্ণ ডাল। নিচে সাদা ফুল, ওপরে আকাশ.....।

— একদম ঠিক বলেছিস।

পারমিতা চায়ের কাপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, — 'বাবার কাছে কয়েকটা টাকা চাইব গো?'

আবার খেনখেনিয়ে ওঠে শিমূল, 'আমি ভিখারি? শ্বশুরের কাছে টাকা চাইব! আমাকে ছোট করার আর পথ খুঁজে পাওনা? চাকরিটা গেছে বলে আজ.....। খাবনা তোমার চা। পালাও, নিয়ে পালাও। মাথাটা বিগড়ে দিয়েছ।

পাশের ঘর থেকে খিন্ন গলায় বাবা চেঁচায়, 'শিমূল, বাবা চেঁচায়, 'শিমূল, বাবা শিমূল। কইরে তুই! কতদিন আইয়ছনা আমার কাছে। এই দিহে আয় বাপ। বন্দুর আমার কাছে। আয়, বাবা আয়'। শিমূল নিজেকেই নিজে বলে, 'মনে হয় ওষুধ নাই। ওষুধ এনে দিতে হবে বাবাকে। যা প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে ওষুধ আনতে যা।

কিন্তু, পকেটে টাকা আছে? ওষুধ মামার বাড়ি থেকে আসবে।

না, না রাগিসনা! মানুষটার বয়স হয়েছেতো। সংসার ঠেলতে ঠেলতে আজ সে ঘরে পড়েছে। ছেলের দায়িত্ব আছেনা! না, বুড়োর কষ্ট পাওয়া দরকার আছে। এই বুড়োটাই আমাকে পৃথিবীতে এনেছিল। কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল পৃথিবীতে এনে আমার মাথার ওপর পৃথিবী চাপিয়ে দেবার জন্য।

এতোটা রেগে গেলে হয়না। এ তো পৃথিবীর নিয়ম।

হুহও, নিকুচি করি নিয়মের। উচ্ছন্নে যাক, তোর পৃথিবী।

ঘড়ি টিকটিক করে আর সময়টা লাগামহীন দৌড়য়। দুপুর, বিকেল হয়। বিকেলটা গড়িয়ে যায় রাতে। আবার রাত, সকালে পৌঁছায় ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়। কী আজব নিয়ম, কোন হেরফের নেই। শিমূলের মনে পড়ে স্কুলের শেষদিন ছাত্রছাত্রীরা ঘিরে ধরেছিল —

স্যার, ১০৩২৩-এর তো চাকরি গেছে।

হুম। গেছে।

স্যার আপনিতো আর আসবেননা স্কুলে!

না।

আপনাকে ফেয়ারওয়েল দেব স্যার। আমরা যে, যার মতো আয়োজন করেছি! চলুন স্যার।

পেছন থেকে ঝড়ের মতো ছুটে আসেন হেডমাস্টার — 'হ্যাই কি হয়েছে, কী হয়েছে ছাত্ররা?

সবাই সমস্বরে জানান — স্যার....।

রাখ এসব। চাকরি গেলে ফেয়ারওয়েল লাগেনা। যা যা সবাই ক্লাসে যা।

আজ তুমুল জোছনা। পৃথিবীজুড়ে কে যেন সাদা-চাঁদর ছড়িয়ে দিয়েছে। বারান্দায় বসে আকাশ দেখে-দেখে মন ভরে যাচ্ছে। একটু পর পর পারমিতা ডাকে, ঐ, রাত হলো তো....। এবার আসোনা ঘরে!'

হোকরাত, তাতে কি? তোমার ঘুম তুমি ঘুমোও। শিমূল হিসেব করে, সহকর্মীরা চাকরি হারা হয়ে এ পর্যন্ত কতজন গেল?

১০৮ জন।

ও, আমি তাইলে ১০৯ নম্বর যাত্রী। সংখ্যাটাও দেখতে শুনতে খারাপনা। ওয়ান...জিরো...। একটা কলম দিয়ে হাতের তালুতে কিছুক্ষণ হাবিজাবি আঁকিবুকি করে শিমূল।

এরপর লিখে '১...০...৯'।

দর্পচূর্ণ

পারিজাত দত্ত। আগরতলা।

চেম্বারের বাইরে রোগীর ভিড় দেখে একটু দমে গেল সুরজিৎ। এখন রাত ৯ টা। এখনও গিজগিজ করছে রোগী। অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে ক্লান্ত রোগী ও আত্মীয়-পরিজনদের চোখমুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। এদের টপকে ডাঃ ছেত্রীকে দেখানো সম্ভব নয়, সুরজিৎ জানে। শহরের ব্যস্ততম চিকিৎসক হলেন ডাঃ অনুপ ছেত্রী। তিনি নেপালি, কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে আগরতলায় থাকেন। ঝরঝরে বাংলা বলতে পারেন। সুরজিতের সঙ্গে পরিচয় পত্রিকার দৌলতে। সুরজিৎ রায় ত্রিপুরার এক স্বনামধন্য সাংবাদিক। একডাকে চেনেন সবাই। তার বাইলাইন স্টোরি নিয়মিত ছাপা হয় রাজ্যের প্রথম সারির দৈনিকে।

ডাঃ ছেত্রীর অ্যাপয়েমেন্ট পেতে দু'মাস আগে বুকিং করতে হয়। ইএনটি স্পেশালিস্ট হিসেবে তাঁর সুনাম রাজ্যেই শুধু নয়, বহির্রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষটি চিকিৎসক হিসেবে যেমন, মানুষ হিসেবেও তেমনি বড়মাপের।

মেয়েটার ইদানিং কানে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। দিপ্সি, তার স্ত্রী, পত্রিকা অফিস থেকে ফেরার পরই বলছিল, "রিঙ্কিকে একটু ডাক্তার দেখাতে হবে"।

সে কেন জানি না ততটা গুরুত্ব দেয়নি, অনেক সময়ই সুরজিৎ এমন করে। কিছু কিছু বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়। কোনও কোনও বিষয় গায়েই লাগায় না। পর দিন রাতে দিপ্সি রীতিমতো হামলে পড়ল, বলল, "তুমি কি গো? মেয়েটার সমস্যা তুমি পাত্তাই দিলে না। সন্তানের দুঃখ-কষ্টে বাবা এমন নিস্পৃহ থাকতে পারে বুঝি?"

এরপর তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতেই হয়। অপরাধবোধে ভুগতে-ভুগতে ফোন করল সুরজিৎ। ডাঃ ছেত্রী অ্যাপয়েন্টমেন্ট একথাতেই

দিয়েছেন। তবে বলেছেন, "যারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিয়েছেন, তাদের দেখে তারপর দেখব। অসুবিধে হবে নাতো? ৯টায় চলে আসুন। একটু অপেক্ষা করতে হবে হয়তো।"

সেই নয়টায় রিঙ্কিকে নিয়ে ডাঃ ছেত্রীর চেম্বারের সমানে এসে দেখল সুরজিৎ রোগীদের লম্বা লাইন। রিঙ্কিকে নিয়ে চেয়ারে বসার আগেই ডাক্তারবাবুর অ্যাটেনডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম"?

রিঙ্কি জবাব দেবার আগেই সুরজিৎ বলল, "ঋতুপর্ণা রায়।"

"এই নামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। দেখানো যাবে না আজকে।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে সুরজিৎ বলল, "দেখানো যাবে। আজই। রিঙ্কি বসে পড়।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অ্যাটেনডেন্ট। সুরজিৎ সদর্পে বলল, "কথা হয়েছে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। বুঝলেন? কতজন রয়েছেন আর?

অ্যাটেনডেন্ট গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "সাত।"

সুরজিৎ চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলো। মুখে যেন বিশ্বজয়ের ছাপ। অন্যান্য রোগীদের অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এখন। মানুষ দু'মাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখাতে হিমশিম খান। আর সুরজিৎ দিব্যি এসে দেখিয়ে চলে যাবে।

এই হয়। যোগাযোগ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভীষণ দামি। সর্বকালেই।

অপেক্ষামান রোগীদের কারো কারো বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

সুরজিতের মুখটা কেমন যেন অহংকারী-অহংকারী হয়ে উঠল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল রিঙ্কির দিকে। অদ্ভুতভাবে তাকেই জরিপ করছে যেন।

"কিছু বলবি?" সুরজিৎ জিজ্ঞেস করল।

রিঙ্কি ফিস ফিস করে বলল, "ওভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে নেই।

তুমি কি ক্ষমতা দেখালে? প্রথমেই লোকটাকে বুঝিয়ে বলতে পারতে যে তোমার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথা হয়েছিল। তুমিই তো বলো, ব্যবহার-ই আসল।"

লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে যেতে সুরজিৎ অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল।

এক ইউরোর কড়চা

অর্জুন শর্মা। আগরতলা।

ভারতীয় স্টেট ব্যাংক থেকে 'ইউরো' নিতে গেলে ব্যাংকের অফিসার বললেন, "ক্যাশ নেই, আপনাকে কার্ডে নিতে হবে"। অগত্যা তাতেই রাজি। যদিও একাউন্টের ব্যালান্স কমে যাচ্ছিল বলে মনে মনে খচখচানিটা ছিলই তবুও ইউরো হাতে নিয়ে দেখার একটা উন্মাদনা ছিল। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে অফিসার বললেন, "এক ইউরো সমান বিরানব্বই টাকা"। মানে প্রায় একশো টাকা! অংকের কাঁচা মাথায় একটু সময় নিয়ে মোটা হিসেব করতেই মস্তিষ্কের ঘিলুতে যেন ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। আমার ছাত্রীর কাছে শুনেছিলাম একটা চকোলেট দুই ইউরো। এখন বুঝলাম আমাদের প্রায় দুইশো টাকা। অফিসারের সামনে চেয়ারের হাতল দুই হাতে চেপে ধরে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। মাথাটা কি পাক দিল! ফাইনাল একটা ডিসিসন চেয়ারে বসেই নিয়ে নিলাম, "অতি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া একটা ইউরোতেও হাত দেব না"। কিন্তু অফিসার আরও গভীর দুঃসংবাদ দিলেন, "যত বেশি পারেন খরচ করে আসবেন, ফিরে এলে কিন্তু আমরা আরও কম দেব, এক ইউরোর বিনিময়ে সাতাশি,অষ্টআশি টাকা"।

আজন্ম কৃপণ আমি। আমার ফিলিজফি হল, "যাচ্ছি ঘুরতে, দেখতে। তাই করব মন ভরে। এতো কেনাকাটার কী আছে! কেনাকাটা তো বটতলা বাজারেই করা যায়"। হাই প্রেসার আরও 'হাই' করে গিন্নি বললেন, 'জন্মের মধ্যে কর্ম একবার যাচ্ছি ইউরোপ। হাত খুলে কিছু কিনতে না পারলে ফিরে এলে মান সম্মান থাকবে?' আমি বাক্যহারা!

প্যারিসের এয়ার পোর্টে লাগেজ নিয়ে বের হবার মুখেই গিন্নির চোখে পড়ে গেল এ.টি.এম মেশিন। গিন্নির শব্দহীন মুখের দিকে তাকিয়েই তরতর করে ফরেক্স কার্ডটা ঢুকিয়ে দিলাম মেশিনে। মুখ ব্যাজার করেই তুলে নিলাম পাঁচশো ইউরো। তখন তো জানতাম না যে এখানেই শেষ নয়, এ.টি.এম কাউন্টারে আরও যেতে হবে!

ফ্রান্সে ইউরো চললেও সুইজারল্যাণ্ডে কিন্তু আর এক ফ্যাকড়া দেখা দিল। ওদের মুদ্রা সুইস ফ্রাঙ্ক। ওরা ইউরো রাখে, তবে ওদের মুদ্রায় কনভার্ট করে নেয়। তাতে নাকি আমাদের টাকার মূল্য আরও কম! আর যেখানেই টাকার পোড়ানি, সেখানেই চকোলেট! এ দেশের চকোলেট নাকি জগতবিখ্যাত। না কিনলে এই দেশ ভ্রমণ নাকি বিফল! সহযাত্রীদের সবাই এইসব বলাবলি করছিল। "না কিনলে প্রেস্টিজ থাকবে কি?" — গিন্নি মনে করিয়ে দিলেন। "তাছাড়া একটা চকোলেট তো মাত্র 'দুই ইউরো'!" গিন্নির হিসেবে 'দুই' যে আমার হিসেবে দুই গুণ বিরানব্বই! এই 'দুই' যে সেই 'দুই' নয় সেই চরম মুহূর্তে কে বুঝাবে তাকে। ইউরো বের করি, বুকটা টনটন করে উঠে। বুক ফাটে, তবু বিদেশ বিভুঁইয়ে এতো সব জেন্টেল ম্যান উয়োম্যানদের মাঝে মুখ ফাটে না। বুক ফাটার শব্দটা গিলে ফেলে মানি ব্যাগ খুলি।

সবচেয়ে গজব ব্যাপার হল জুংফ্রাউজো আরোহণের আগে। উঠতে হলে জনপ্রতি গুণতে হবে একশো আশি ইউরো করে! মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যাবার জন্য যথেষ্ট। গিন্নির সহজ সরল কথা, "বইতে কত পড়েছি আল্পস পর্বতমালার কথা! এখন নিচে এসেও উপরে উঠতে পারব না! ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কীভাবে? এরকম হলে টাকা আগলে ঘরে বসে থাকলেই হয়! তাছাড়া এটা নাকি 'টপ অফ ইউরোপ'! একবার উঠতে পারলে কত গল্প করা যাবে সারাজীবন"। আমার ভাবান্তর না দেখে গিন্নি যোগ করলেন, "আমাদের বটতলা বাজারে তো একশো আশি টাকা দিয়ে আধা কেজি মাছও কিনতে পারো না। আর এখানে উঠে যাবে ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। কত বাহবা দেবে সকলে দেশে গেলে!" গিন্নি গুণছেন একশ আশি, আমি হিসেব কষছি একশো আশি ইনটু বিরানব্বই! মাথা কাজ করছে না। শেষ চেষ্টার জন্য মিনমিন করে বললাম, "এত উপরে উঠলে বুকে ব্যাথা হবে না তো? হাই অল্টিচ্যুড তো আমাদের মত বুড়োদের এভয়েড করা উচিত"। গিন্নির মোক্ষম দাওয়াই, "তেরো হাজার ফুট অল্টিচ্যুডের কারণে তোমার শক্ত বুকের কিছু হবে না, হবে তোমার টাকার দুঃখে। তোমাকে আমি চিনি না!" আর কথা চলে না, টিকিট কাটতে দিয়েই দিলাম। দূরবর্তী বাস জার্নির সময় অনেক ঘন্টা পর অটোগ্রিল-এ বিরতি দেয়। ভাষান্তরে নেমে ছোটো বাইরে, বড়ো বাইরে করেন। এতে কোনো অসুবিধা নেই। অসুবিধা হল সেখানে জমকালো সব জিনিস, খাবার সাজানো থাকে।

ট্যুরিষ্টদের পকেট ধোলাইয়ের ব্যবস্থা আর কি। যেখানে নামি সেখানেই নানা বাহানায় ইউরো বের করতে মনে কষ্ট লাগে না! একবার এমন হল যে অনেকক্ষণ ধরে কোনো অটোগ্রিল আসছে না। সকলেই উসখুস করছে ছোটো বাইরে যাবার জন্য। শেষে একটা পাওয়া গেল। বাস থামতেই তরতর করে সকলেই নেমে গেলাম। কিন্তু মহা বিপদ! 'বাইরে' যেতে হলে এক ইউরো লাগবে। বিনা ইউরো-তে সূচ্যগ্র মেদিনী, থুড়ি ফোঁটামাত্র ইউরিন নয়! শুনে তো কিডনি ফাংশন বন্ধ হবার জোগাড়। দেশের ডাক্তার বলেছিল ক্রিয়েটিনিন বেশি হলে নাকি কিডনি ফাংশন বন্ধ হয়ে যায়। এক ইউরো দেখছি ক্রিয়েটিনিন থেকেও বেশি কার্যকর! শুধু তো 'এক' নয়, দুজনের 'দুই' ইউরো! মানে দুই গুণ বিরানব্বই। মোটামুটি দুইশো টাকার ধাক্কা শুধু ছোটো বাইরে যাবার জন্য। এ কী দেশ রে বাবা! সবাই মনের আনন্দে টকাটক ঢুকে যাচ্ছে। ভাবটা এমন, 'তবু তো পাওয়া গেল'। গিন্নির চিরপরিচিত মুখের নিঃশব্দ ভাষা পড়লাম, "অনেক কিপ্টে দেখেছি বাপু, একটা ইউরো খরচ করতে যেন বুক ফেটে যায়!" দ্রুত গিন্নির হাতে একটা ইউরোর কয়েন গুঁজে দিই। গিন্নি ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করি। আরও একটু ভাবি। গিন্নি আসতেই মুখে হাসি। হাতে একটা গিফট টোকেন। কয়েন ঢোকানোর পরেই নাকি যন্ত্র থেকে এটা বের হয়। আর এটা দেখালেই দোকানদার একটা চকোলেট দেবে। কাল বিলম্ব না করে ঢুকে গেলাম। না হলে যে কী হত জানি না। উপরে দেখাতেই একটা চকোলেট দিয়ে দিল। তার মানে কি এক ইউরো দিয়ে দুই ইউরো'র চকোলেট! এ কী দেশ রে বাবা! মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল।

ভ্রমণ শেষ। ফ্রাংকফুর্ট বিমান বন্দর থেকে আকাশে উড়তে হবে। আমাদের বাস ঢুকল তিন নম্বর টার্মিনালে। ট্রলি ছাড়া ঢাউস লাগেজ টানা যাবে না। অনতিদূরেই দেখা গেল ট্রলি সাজিয়ে রাখা আছে। খুশি মনে সবার আগে দৌড়ে গেলাম। ট্রলি ধরে দিলাম টান। একটু এসেই গেল আটকে। বার বার টেনে দেখলাম। পরে খেয়াল করে দেখলাম নিচে ট্রলির চাকা একটা ধাতব রেলিং-এর উপর দিয়ে এসে আটকে গেছে। বুঝলাম না ব্যাপারটা। আমার পিছে দাঁড়িয়ে কোচার দাদা মুচকি মুচকি হাসছেন। তাঁর আসল নাম উমিদ সিং কোচার। স্ত্রীর নাম রাজকুমারী। রাজস্থানি হলেও আজন্ম কোলকাতার বাসিন্দা। তবুও বাংলায় হিন্দি টান। রাজকুমারী দিদি আমাকে প্রথম থেকেই বলেছেন, ''আপনি আমার ভাই আছেন''। দিদিদের লাগেজ সকলের চেয়ে বেশি। এই বয়সে এতো লাগেজ নিয়ে কেউ আসে! এই নিয়ে প্রথম দিন আমরা হাসাহাসি করেছি। দ্বিতীয় দিন বাস ছাড়তেই লাগেজ রহস্য উন্মোচিত হল। কোচার দিদির আদেশে দাদা হাতে বড়ো বড়ো প্যাকেট নিয়ে প্রত্যেকের সামনে মেলে ধরছেন হয় ভুজিয়া, নয় কুরকুরে, নিমকি মাই মোরব্বা ইত্যাদি। সব কিছুই রাজকুমারী দিদির নিজের হাতে ঘরে তৈরি করা। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সেই সুদূর কোলকাতা থেকে এতো বড়ো বড়ো প্যাকেট, ডিবি বয়ে আনা — এ এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। তাও একদিন নয়, প্রতিদিন। আমরাও এরপর থেকে বাস ছাড়ার একটু পরেই বলতাম, "দিদি, আজ কিছু খুলছে না যে?" দিদি হেসে সঙ্গের ব্যাগ খুলে তখনই কোচারদাদাকে ধরিয়ে দিতেন।

যাই হোক, আমার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে কোচার দাদা মুচকি হেসে বললেন, 'আরে, এই যে এখানে কিছু লেখা রয়েছে। দেখলাম এ.টি.এম এর মতো একটা মেশিনে লেখা আছে এক ইউরো দিয়ে ট্রলি নিয়ে যেতে হবে। মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। কিন্তু ট্রলি নিয়ে না গেলে আবার এক ইউরোর জন্য বেইজ্জত হতে হবে। পকেটে তখনও একটা ইউরো'র কয়েন ছিল। হাতে নিয়ে মেশিনে ঢুকাতে চাইলাম। ছিদ্র আছে, কিন্তু কয়েন ঢুকছে না। কোথাও কিছু হচ্ছে না। বাহ্যিকভাবে না হলেও মনে মনে বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম। কোচারদাদা নিজের ফোরেক্স কার্ড বের করে ছোঁয়াতেই একটা ট্রলি টেনে বের করে নিতে পারল। আমি এবার কী করি? কয়েনটাকে আবারও এখানে সেখানে চেপে দিতে বৃথা চেষ্টা করলাম। হঠাৎ একটা সেই দেশিয় লম্বা লোক পাশের উঁচু জায়গা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে এসেই আমার হাতের কয়েনটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। মাথা এমনিতেই গরম ছিল। এই উৎপাতে আরও গরম হল। কী বলব বুঝতে পারছি না। মনে মনে বকে দিলাম। ইংরেজি বলতেও ভুলে গেছি। শেষে মেজাজি গলায় বিশুদ্ধ বাংলায় বললাম, "ইয়ার্কি পেয়েছ? আমার এক ইউরো'র কয়েন দিয়ে দাও এক্ষুণি, নইলে..."। নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়, 'নইলে' কী করব? কী করতে পারি? তাই বলে এক ইউরো ছিনিয়ে নেবে? এক ইউর মানে বিরানব্বই টাকা! এ যে দিনে ডাকাতি! কেমন দেশ? এতদিনের প্রশংসা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিলাম। একি, লোকটা মানি ব্যাগ খুলছে। ইউরোটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নেবে! নেব নাকি ছোঁ মেরে টান দিয়ে? আজানুলম্বিতবাহু আমার হাতটা মুচড়ে দিলে আর দেখতে হবে না। ধারে কাছে দলের কাউকে দেখতেও পাচ্ছি না। দেখি কয়েনটা রেখে সে একটা কার্ড বের

করে যন্ত্রে ছোঁয়ালো। আমাকে হাতের ইশারায় বলল ট্রলিটা টানতে। কলের পুতুলের মতো টান দিলাম ট্রলি। গড় গড় করে চলে এল ট্রলি। মনের আনন্দে একবার সামনে একবার পেছনে তাকাই আর ভাবি এ কেমন দেশ! লোকটা তখনও দাঁত কেলিয়ে হাসছে! কোচার দাদার সঙ্গে দেখা হলেই বললেন, "আরে চিন্তার কিছু নেই, ওই এক ইউরো আবার আপনার কার্ডে জমা হয়ে যাবে"। সর্বনাশ! বলে কী? আমার কার্ড তো বের করতেই ভুলে গেছিলাম। ওই জার্মানটাই তো আমার কার্ড নেই ভেবে...! একটা ইউরো মানে বিরানব্বই টাকা! হায় হায়!

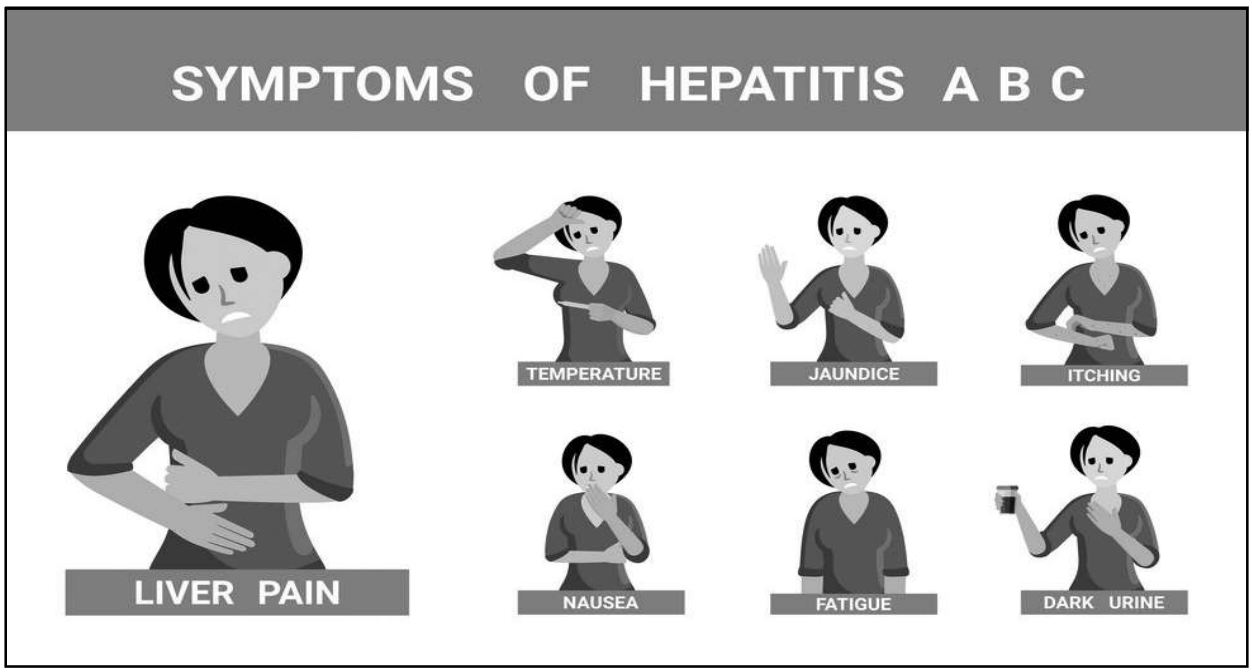

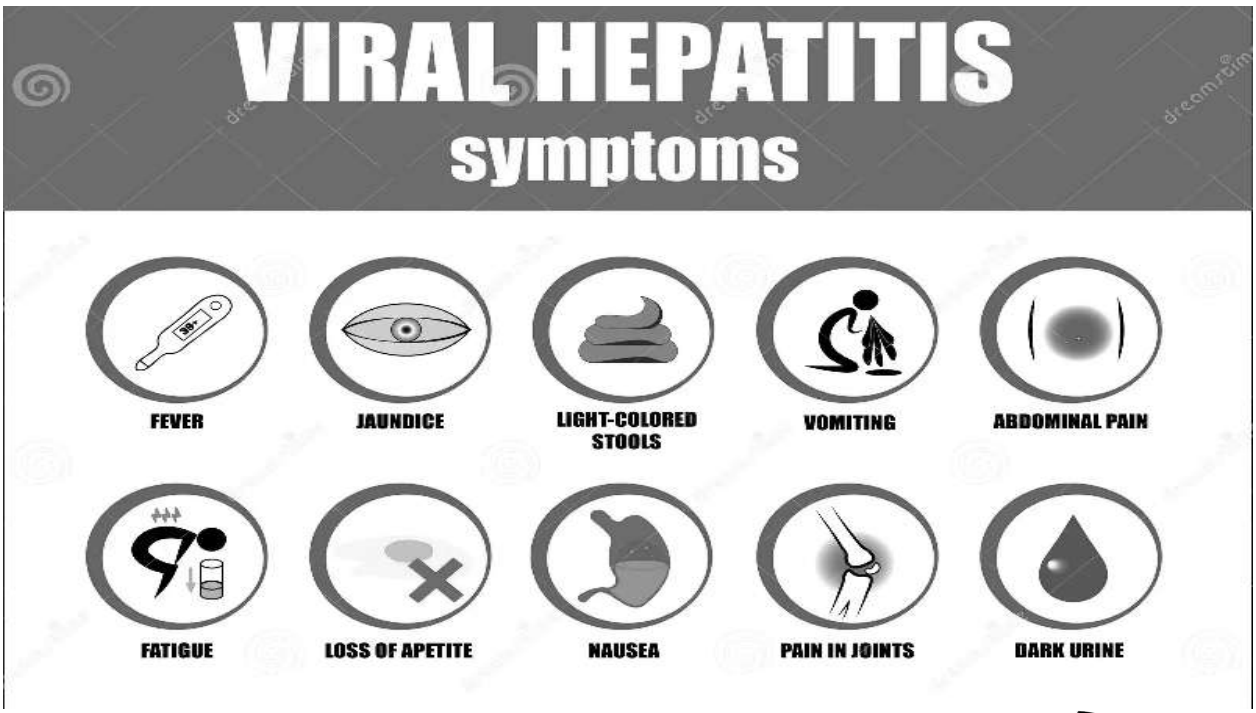

দিনকাল

কল্যানব্রত চক্রবর্তী। আগরতলা।

মাঝরাতে, ঘুম ভেঙে যায়,
যেন আর্তনাদ করে কেউ কাঁদে,
আতঙ্ক ছড়িয়ে এম্বুলেন্স ছুটে যায়
অন্ধকারে;

এতো কলকণ্ঠ, রঙিন ফোয়ারা,
মনের দীনতা যায় না কিছুতেই,

গত রাতে অলৌকিক বুলডজার
ঘুমন্ত বস্তিতে হামলে পড়েছিল,
গরীবের ঠাঁইটুকু মিশেছে ধূলোয়।

শিশু-বৃদ্ধ, নারীপুরুষ অন্ধকারে
দলবেঁধে হাইওয়ের পাশে গাছতলায়,
সাঁই সাঁই ছুটছে, দামী গাড়ি,
তাকাচ্ছেনা কেউ;

রাজধানীতে এলাহি আয়োজন,
কয়েক হাজার কোটি উড়ছে হাওয়ায়,
সভা হবে, ভোজ হবে, মান্যগণ্য,
দেশী বিদেশী।

আর ওরা বস্তির ঝুপরিতে থাকে,
মাথা নুইয়ে ঢুকতে হয়,
তেলচিটে নোংরা পোশাক,
দুয়ারে পথের কুকুর এসে শোয়।

ভয়ার্ত হাহাকার আমাদের চারপাশ
ঘিরে আছে, পতনের গাঢ় শব্দ
শুধু খুলে দিতে পারে।

স্বর্গ আমার চাই না

বিজন বোস। সাব্রুম।

স্বর্গ বলে কিছু আছে কী?
যদি থাকেও তা আমার চাই না।
এই পৃথিবীর আলো বাতাস জল
নিয়ে বেশ আছি,
ছোট বেলার বন্ধুরা দেখা পেলে
এখনও বুকে জড়িয়ে ধরে।
শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে দেখা হলে
স্বস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন,
বুকের উত্তাপ আর স্নেহ পরশ আমার কাছে স্বর্গ।
ফুল বাগান খোলা মাঠ পুকুর নদী যেখানেই যাই
দারুণ সুখ,
বাসে ট্রেনে ভ্রমনকালে কত বন্ধু জুটে গেছে
কারো কারো বাস হৃদয়ের অন্ত:স্থলে।
দিন শেষে রাতে যখন ফিরি
ছোট্ট ছেলটি গ্রীল খুলে বেড়িয়ে এসে
যেভাবে জড়িয়ে ধরে,
মেয়েটি শাসনে সোহাগে যখন মা সাজে
স্বর্গ সুখ আমার কাছে তুচ্ছ।
বাবার আদর আর মায়ের স্নেহ
সাত স্বর্গ সমান,
স্বর্গ চাই না আমি মায়ের আঁচল চাই...

বাজুক বসন্তের গান

মানিক ধর। আগরতলা।

চলছিলো ভালই।
তিন ইয়ারী বন্ধু সঙ্গ, আনন্দ মোচ্ছব।
বিষাদ নয় আনন্দ জ্ঞাপন।
কখনো কেউ যদি দার্শনিক আখ্যানে মৃত্যু ভয় নিয়ে আসে, টেবিলে থাপ্পর মেরে, তাড়াই সে ভুত।
আবারো জীবনে জীবন বসাই, মৃত্যুরে তাড়াই ফুৎকারে।
বিহার আনন্দ পালে কেন, কোন চুপিসাড়ে তবুও একদিন পালে বাঘ এলো।
কুকড়ানো হৃদয়ে ধীরে বাসা বাঁধে মৃত্যু ভয়, মৃত্যু যেখানে সেখানে, মৃত্যু বিছানাময়।

এতদিন তো ভালই ছিল সব, ঘড়ি সময়ে চলত, এখন যেন মাঝে মধ্যে বিরাম স্তব্ধতা।
সময়ের ঘড়ি আর তেমন নিখুঁত বাজে না এখন।
সন্তান সন্ততি, আকাঙ্খার সুখ স্মৃতি আর কোলাহলকে জীবন মেনেছি এতকাল।
বাতাসে ব্যাপ্ত ছিল প্রেয়সী সুগন্ধী আঘ্রান।
তোমরা যে বলো, বীর্য আরো যা যা সুখী যাপনের সবইতো ছিল।
এখন শুনি অপসৃতের পদধ্বনী।

এখন দিগন্তে সূর্য্যের প্রাবল্য নেই, অন্ধকারে ডুবছে পৃথিবী।
বাতাসে অনন্ত শৈত্য কাঁপিয়ে যাচ্ছে হাড়।
এক অগ্রজ কবি সেই করে, নিরাবরন উলঙ্গ ছেলেটির জন্যে সূর্য্যের কাছে উষ্ণাষা প্রার্থনা করেছিলেন,
এখন অবাধ্য সূর্য্য বড়োই বেয়াড়া।
তারো আগে এক প্রাজ্ঞের প্রার্থনা ছিল "মৃত্যুকে ভেদ করে ফিরে আসুক নির্ভুল!
রাশি রাশি শষ্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চার্য সফলতায় মৃত্যুকে দীর্ন করে বরফের কবরে ফুটুক ফুল।
মৃত্যুর তুষার পাহাড় অপসৃত হোক।
মিনতি না ঘাড় ধরে ফেরাবো তাকে আবার জীবনে।
শীতের প্রার্থনা আর নয়, এবার বাজুক বসন্তের গান।

রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও কবি সত্যব্রত চক্রবর্তী ও বিমান বিহারী ধর যথাক্রমে কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ও মানিক ধর নামে কবিতা লেখেন।

ওয়ান্ট জাস্টিস

সমীর ধর। আগরতলা।

টিপে ধরলে গলা
বিকৃত ধ্বনি বাড়ে শুধু
সুর আসে না।

চেপে ধরলে হাত,
কেট দিলে গলা,
চুপ ব্রজদোতারা বা রবারের তার,
অবশ কিবোর্ড কলম তুলি কিংবা
ইভিএমের সন্ত্রস্ত আঙুল
গহ্বরে সজাগ প্রহর গোনে -
পোষ মানে না।

পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে
সমস্ত মন্দির মসজিদ গির্জা,
ধ্বস্ত ধর্মবিশ্বাস,
দগ্ধ বাড়িঘর, রাবার বাগান, লুণ্ঠিত পুকুর অথবা
খুকু-র ইজ্জত, ছিন্নভিন্ন করতে চাওয়া ভিন্নমত
অথবা
জাস্টিস ফর ১০,৩২৩
মুছে যায় না।

মণিপুর থেকে বাংলাদেশ হয়ে আর জি করে
পৌঁছানোর পর
বুদ্ধিজীবী চুল ছেঁড়েন,
ধর্ষণের পর হত্যা না
হত্যার পর পরচুলা-ধর্ষণ!
আমাদের ঘিরে প্রতিদিন
অভয়া, তিলোত্তমাদের অসহ্য ভিড় বেড়ে চলে..।
শুনেছি, এই সমস্ত কিছুর জাস্ট একটামাত্র জাস্টিস।
কবে?

কথামালা

শুভাশিস চৌধুরী। আগরতলা।

যে যার মতো আসে
যে যার মতো চলে যায়
কেউ কেউ দাগ রাখে বিনাশে
কেউ বা নিজেকে সৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায়।।

এই যে শুধু যাওয়া আসা অনর্থক কথা বলা।
এই যে শুধু স্রোতের টানে ভেসে চলা
এই ভাবনা সবার ভাবনা নয় বলে
এখনো কেউ কেউ চিৎকার করেই যায় —
প্রচারমাধ্যমই শেষ কথা নয়
মানুষই শেষতক্ মনের কথা কয়।।

রাম কিংবা কৃষ্ণ ছিলেন কি? নিয়ে যদিও তর্ক হয়
"মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক" নেই কোন সংশয়।।

নাবিক জন্ম

অশোক দেব। উদয়পুর।

এজন্মে যে কবি, পরের জন্মে সে
নাবিক হয়েই আসে জলের জগতে।
নৌবিদ্যা শিখতে লাগে
নারী ও নক্ষত্র,
পাঁজরের হাড়, পুরনো পালের কাপড়,
মৃতের কম্পাস।

গোপন ভূমির খোঁজে প্রতিটি নাবিক
একদা
জলের দিকে যায়।
অভীষ্ট ভূমির আগে ভুল করে
নেমে পড়ে
মিছেকথার দ্বীপে ...

অতই মোহন আর অতই মায়াবী
সে দ্বীপ,
কিছুতে বেরোতে পারে না সে—
নৌচলানা ভুলে
মরে পড়ে থাকে ...

আমাদের পৃথিবীতে
অসংখ্য পুরুষ আর
অসংখ্য প্রেমিক

এরা তো আসলে কঙ্কাল।
মিছে কথার দ্বীপ হতে পাঠানো হয়েছে তাদের।

সমুদ্র স্বভাবে রমণী
ঢেউ পোষে, তুলে রাখে
কিন্তু ব্যর্থতা রাখে না ...
নাবিকের বা নৌকার

ফিরিয়ে দেয়

বসন্ত প্রলাপ

শুভম বনিক। উদয়পুর।

১

প্রত্যেক রাতেই ব্যর্থতার সেলামি,
কিপ্টে সময় নিজেকে জাদুকর ভাবে,
গতকাল রাতের ভুল সঙ্গম
চাঁদের আলো ফিকে করেছে,
বসন্তের দ্বিচারিতার ফলে
নেশা থেকে বের হয় পচা গন্ধ,
জানালার পাশের মৃদু বাতাস
এখনো বলতে পারছেনা
কিভাবে মৃত থেকে ঈশ্বরে পরিণত হই।

২

ঘোর থেকে উঠেই দেখি
একদল কুকুর খুবলে খাচ্ছে
আমার জীবন সংক্রান্ত কবিতাগুলো,
আমি পাশেই বসে
আবার বসন্তে মনযোগ দেই।

একটি শব্দ, অনেক আওয়াজ

আকবর আহমেদ। আগরতলা।

১.

শব্দের বর্ম ছাড়া কোনো আলোড়ন হয় না,
অন্তরের হাহাকার ছাড়া যেমন উদয়াস্ত হয় না!
অথচ, মানব হয়ে দানব রুখতে কিছুই যথেষ্ট নয়।
জানা অজানা পথের প্রান্তে, নিরাপদ জঙ্গলের
আস্তানার জোর চিৎকার, গোপন কথাবার্তা,
ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, এক্সহ্যন্ডল,
কোনোকিছুই আর অরাজনৈতিক নয়।
আমাজনের ঘনজঙ্গলে আগুন! গ্রামগঞ্জে হায়েনার
আনাগোনা! ঘরভাঙা-ঘরপোড়া! ধর্ষণ ও খুন!
সামনে পেছনে সারি সারি মানুষজন, যারা কাঁদতে
জানে, হাসতে জানে, অপেক্ষা করতে জানে!
ভালোবাসার জন্যে মরতে দ্যাখেও যে ভাবে
নীরব থাকাটা একান্ত ব্যক্তিগত!
উপোস পেটে থুতু গিলে খাওয়া, নিজের মতো
বিশ্রাম খুঁজে নেওয়াটাও ব্যক্তিগত!
মহারাজের স্বাদ-আহ্লাদ ব্যক্তিগত!
বুলডোজার, দাঙ্গা, এনকাউন্টার, উপা!
কোনো কিছুই সাম্রাজ্যের অধীনে নয়!
সবকিছুই জিজ্ঞাসার বাইরের বস্তু, বিনয়ে ল্যাপটে
থাকাই জীবন! তাকে আমি কী বলে সম্বোধন
করব? লোলুপ! লম্পট! নিরীহ! না কবি!
সবাই জানে শব্দকে হাতের মুঠোয় ধারন করা শিখতে
হয়। হাত এবং পায়ের সাথে মাথার সংযোগ ঘটাতে
না জানলে শব্দেরা রঙীন
হয় না। আকাশে উড়ে না। সবাই নতমুখ অভ্যস্ত
বলেই নীরবতার প্রকৃত বয়ানে ভীত হয়ে যায়।
এভাবেই জিজ্ঞাসার বাতাস আক্রান্ত হতে হতে
শব্দেরা নীরব হয়ে বুকে আঘাত করে বর্ম হয়ে!
আমি অন্তর পেতে রাখি অন্ধকারে।

২.

এই গহীন অন্ধকারেও পাহাড়ের চূড়া একটু
বেশিই আলোকিত থাকে। অন্তর তখন একবার
লেখে, একবার মুছে ফেলে নিজেকে।
মুহূর্তগুলো খসে পড়ে যত্রতত্র। বাইরের আলো
ভেতরের আগুন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমার
গোটা শব্দভান্ডারই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
একটি কালেশ্বর হরিণ এসে সামনে দাঁড়ায়
মুহূর্তের নীরবতা ভাবের উদ্রেক ঘটালেও
পাহাড় আমাকে ডেকে নিয়ে যায় খোলা উঠানে।
এখানে হৃদয়পোড়া ছাইয়ের অনুসরণ করে সবাই,
শব্দময় একাকিত্বের অস্তিত্ব আমি টের পাই।
এই পাহাড় থেকে নেমে আসা এক নদী অন্ধকার
ভেদ করে উর্বর সমুদ্রের দিকে ছুটে গেছে-
প্রতি রাতে এই নদী আমার জন্য অপেক্ষায় থাকে!

৩.

এই বিজুনি নদীর মতো সবাই আমার জন্য
অপেক্ষা করবে এমন নয়, আমি বুঝি তাই চাই?
এই ব্যামোর নাম হীনমন্যতা অথবা বক-তপস্যা!
এই অপ্রেমের নাটক মিথ্যা-সংলাপ পছন্দ করে
না, শব্দেরা নাটুকেঅভিনয় পছন্দ করে না বলেই
আলোর মতো স্ফটিক,ভারি এই নদীর কণ্ঠস্বর।
প্রতিটি ধূর্ত অপরাধকে চিহ্নিত করে সে ছুটে ...
ক্ষুদ্র অথবা গোপন কোনো সাক্ষী সঙ্গে রাখে না।
সীমালঙ্ঘনকে পরিত্যগ করে আবার গ্রহণ করে।
চারপাশের চপল নিষ্ঠুরতা, ফাঁপা অনুভব, ভিড়ের
কোরাস সে অস্বীকার করে অবলীলায়।
আমরা চিৎকার করি একক কণ্ঠে, সমস্বরে...
নোংরা উঠান ঝারু দেই, প্রতি প্রভাতে।
যেভাবে খাবারের থালা আমাকে সক্ষম করেছে,
যেভাবে খোলা জানালা স্বাধীন দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে,
যেভাবে নদী শিখিয়েছে সতর্কতা হল লুকানো
শৃঙ্খলা। পতনের চিহ্ন ধারন করে প্রতিটি সিঁড়ি।
প্রবেশের দরজা সবসময় খোলা থাকে না। ভয়
দেখাতে পারে এমন শব্দ আমন্ত্রণ জানাতেও জানে।
ফোনে ছোট্ট স্পিকারটির শব্দ, সিঁড়ি ওঠার শব্দ।
নামার শব্দ, কেটলিতে ফুটন্ত জলের শব্দ,
তুমুল আলোড়নের শব্দ, সবকিছু তোমার জন্য
অপেক্ষা করছে।
নদীই আমাকে শিখিয়েছে এইসব কথা...
বলেছে, জগতের নির্বাক প্রাণীরাও এসব বুঝে!

KAWALANDA

Pradip Murasing. Udaipur.

Ang hug Kawalanda, jora no mwrwgwi
Yak sokma joratwi, chaitokjak,
Omra no, sal bai baksa, Sal no nairwgwi,
Sal kasa o, Sal thang o, twisa ni.
Twisa twi, kochokhlai thang o,
Thang o, sal ni b'khak, tal ni bwkhak,
Abo thakma kwrwi, paiphlaima kwrwi.
Hating ni hati hai gulbakma chajak.
Baithang ni kothama swina ni
Sabo ? sabo ni khachuk ? Imang ni hachuk ..
Thikna nairwmang, nairwmang
Swkal ni phola bwkhuk sini ni kothama.
A kothoma tabuk nokbar ni khuk khuk
Kokduk ni khorang bai, Yamrokni khorang,
Pinlaha uatwi. soi nokbar bai uatwi thancha wng khe
Kaisa kotor bayung nokha no lilakrwi,
kochok rwi mano, imang ni maichwlwi.
Nokbar tungphla jak tabuk, yang wyang.
Kaisa kothama no twwi.

Kotkoma ani rangchak ni.
Sabo asuk sraimwng rwlang tini
Khiliwi- khiliwi, charwi abuktwi
Lobsini lobwi, mwng pharterwi
Rangchak ba torsawi loksawi
Phaikha ble kalangsing uasong ni muiya hai.

Yang lenglama kwrwi ama
Lengo, sichao, hating bai baksa
khachik mang, khachik mang,
Rangchak ni imang , miling mwlang,
Uaksa, urikhwng khurtwi
Hachuk Halap, bwlap bwlap,
Tei busuk ba hakchal kho
O rangchak, uawing khilijak
Nobarchang sibsajak
Ani nini thinang.

কাউালান্দা

আমি জুমের কাউালান্দা।
যত দূর সম্ভব দৌড়ুচ্ছি
সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে,
প্রতিদিন সূর্য উঠে
দিনান্তে অস্ত যায় ছড়াটির।
ছড়ার জল ভাটিতে বয়ে যায়,
বয়ে যায় সূর্যের দিকে, চন্দ্রের দিকে,
তার প্রবাহমানতা নিরন্তর
জগতের গোলকধাঁধাঁর মতো।

স্বপ্নের পাহাড়, কার হৃদয়ের তুমি,
কেউযেন লিখতে চায়
আত্মকথনে,
গুলিবাঁট করে করে, জানা গেল
ডাইনির সাতবোনের আনাগোনার গল্প।
সেই গল্পই এখন বাতাসের মুখে মুখে
ফোনের আলাপে, প্রতিধ্বনি হতে হতে
বৃষ্টি নেমে এলো যেনো,
বৃষ্টি আর বাতাস এক হয়ে
বড় এক সাইক্লোন আকাশ কাঁপিয়ে
ভাসিয়ে নিতে পারে স্বপনের বীজ,
এখন গরম বাতাস বইছে, এদিক ওদিক
একটি গল্পকে কেন্দ্র করে,
গল্পটি আমার সোনার
এত অভিশাপ কে যেনো দিয়েছে আজ
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির গল্পে
মায়ের দুধে, লাডলা আমার
সোনাটি কালাংসি বাঁশের করুলের
মতো বেড়ে উঠেছিল।
এই দিকে ক্লান্ত মা আমার
জ্ঞান হারাবার পালা
বিপনির বিজ্ঞাপনের সাথে
পাল্লা দিতে দিতে
সোনার স্বপ্ন লন্ডভন্ড,
শূকর ছানা উই পোকার খোঁজে
পাহাড়ি ঢাল তন্ন তন্ন করে যেনো,
আর কত দূর, হে সোনা-
দোলনায় লালিত
মৃদু মন্দ বাতাস
তোমার আমার আকাশ।

ভাষান্তর : স্মৃতি দেববর্মা। উদয়পুর।

নীরা তোমার জন্য

অরূপ হালদার। বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ।

কেমন আছো নীরা? নিশ্চয় সবাই কে নিয়ে খুব ভালো আছো?
জানো নীরা, কতবার ভেবেছি আমি তোমাকে ভুলে যাব, তবুও বারবার স্বপ্নে এসে আমাকে ধরা দাও। আমাদের স্মৃতিগুলো যেন ভাবনার মিনারে ধাক্কা খেয়ে, চুরমার হয়ে পড়ে। কি করি বলতো? তুমি বারবার আমাকে বোঝাতে চেয়েছো, কোনদিনই আমি তোমার হতে পারবো না, এটাও যেমন সত্যি তেমনই বুঝিয়েছো তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। এই টানাপোড়েনে আমরা সবাই কে হারালাম।

এই নীরা? তোমার মনে আছে, কলেজের সোসালে তুমি কি সুন্দর সেজেছিলে ! নীল রঙের শাড়িতে ... সেদিন তোমাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো। আমি তোমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তুমি বলেছিলে আমার সাজ, আজ স্বার্থক। তারপর হই হুল্লোর, আনন্দে মাখামাখি একটা দিন। সবই যেন আজ স্বপ্ন। তোমার একটা ফোনের বা ম্যাসেজের অপেক্ষায় কাটতো আমার সারাদিন। আমি ফোন ব্যাক করতে দেরি করলে, যেন আগুন ধরে যেত জঙ্গলে।

কিন্তু আজ দেখো ! আর সেই আকাঙ্খা নেই। আমার Whatsapp এ তোমার কত un-read sms একবার দেখতে ও ইচ্ছে করে না। কেন বলতো? স্মৃতি যত মধুরই হোক সেটা বেদনাদায়ক। তুমি যখন স্বামী সোহাগে মশগুল, আমি জানলার পাশে বসে নিকোটিনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িয়ে, আকাশের তারা গুনি। তুমি যখন তোমার নরম বিছানায় শরীরটাকে উন্মুক্ত করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাও, আমি ! ওয়াড় ছাড়া বালিশ আর ছেড়া পাজামা পরে শক্ত বিছানায় রাত জাগি। তুমি যখন তোমার স্বামীর অফিসের টিফিন গোছাতে ব্যস্ত আর আমি অসুস্থ মায়ের জন্য ভাত ফোটাই।

শোনো নিরুপমা সেন, তুমি তোমার জীবনটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছো। নিজের জগতের মর্যাদা দিয়েছো, ভালোবাসাকে ভুলে যেতে পেরেছো কিন্তু আমি পারিনি কারন ভালোবাসা একজনের জন্যই।

এখন সব সখ আহ্লাদ মিটিয়ে, স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে sms করো কেমন আছি। তোমার তো গর্ব হওয়া উচিত, আমার জন্য। একটা ছেলে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে শুনে, না তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য, আমাকে খোঁচা দাও, কতটা খারাপ আছি। তুমি বারবার বোঝাতে চেয়েছো, তোমার স্বামীর শারীরিক অক্ষমতার কথা। এখানে আমার কি করার আছে বলো? টাকা, পয়সা, গয়না, গাড়ি, বাড়ি সবই তোমার বর্তমান। আর আমি ! ভালোবাসা হীন, নিঃসম্বল একটা তুচ্ছ মানুষ। তবুও বলি নীরা-একটু মানিয়ে নাও না, দেহের উপর নির্ভর করে কোন সম্পর্ককে ভেঙে দিও না। কারন আমি জানি সম্পর্ক ভাঙার যন্ত্রনা কতটা গভীর?

প্রভেদ নেই

সঙ্ঘমিত্রা নিয়োগী। উদয়পুর।

পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই কোলাহল ডাক দেয়
হাত তুলে ইঙ্গিত করি
ঘোর সরিয়ে বেরোতে পারি না ;
জখম, কিছু প্রতিবাদ, ধর্ম ও দলীয় ভাষণ
বোতলে ভরে রাখি।
দৈনিক ঘুম আর মৃত্যুর প্রভেদ বুঝতে পারছেনা
খবরের কাগজ।

শহরের রাস্তায় মরা কাক দেখতে ভিড় জমেছে
প্রতিবেশীর জানালা নেই বলে
অভাবের যন্ত্রণাগুলো ঘর পাহারা দেয়
হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীর পাহারা দেয় রাত ...

সমস্ত না থাকার মাঝেও সময় লিখি

উদযাপনের ঘুড়ি

চন্দ্রিমা সরকার। আগরতলা।

দীর্ঘ মেয়াদি বৈঠক শেষ।
সময় পেরিয়ে গেছে
জলের তলায়।
একটা গোঙ্গানি ভেসে
আসছে এখনও।
নদীর পারে তাজা হয়ে
ধরা দিয়েছে ক্ষতচিহ্ন।
ধ্বংসের পারে ভেসে ওঠা
সাদা শিউলি ফুলের গায়ে
লাল রঙের কী যেনো
একটা ছিটিয়ে আছে!
বষ্টুমীর নাকের তিলক
আর পলি মাখা হাঁটুর উপর
ভর করে ভেসে আসা
কাঠামোর শুকনো হাড়েও
জেগে আছে প্রতিবাদ।
কাদায় মাখামাখি
ছোপ ছোপ রক্তের দাগ
লেগে থাকা অভয়ার
অস্পষ্ট শরীরে,
স্পষ্ট হলো না উৎসবের বানান।
অথচ চায়ের টেবিলে বসে
উৎকট ডিজের ভিড়ে
মিছিল আর ত্রাণের
খবরের পাতা কেটে
আমি আর তুমি -
কেমন দিব্যি একাই বসে
ঘুড়ি উড়াই উদযাপনের রাতে।।

বিশ্বাসী নই, তবুও

শঙ্কর ভট্টাচার্য। উদয়পুর।

বিলাপে বিশ্বাসী নই,
বিশ্বাসী নই প্রেমে বা অপ্রেমে।
তন্ত্রে-মন্ত্রে বিশ্বাসী নই
বিশ্বাসী নই তাবিজ বা কবচে।
তবুও কেন জানিনা ঈশ্বরকে বলি
যেনো পেয়ে যাই তোমাকে।
ভালোবাসায় বিশ্বাসী নই,
অভ্যস্ত নই শারীরিক প্রেমে -
তবুও কেন জানিনা কখনো কখনো
মন পেতে চায় তোমাকে।
বিশ্বাসে আমি কখনোই বিশ্বাসী নই;
নই বিশ্বাসী কোন প্রতিশ্রুতিতে।
তবুও কেন জানিনা ইদানিং আমার
বিশ্বাস করতে হয় তোমাকে।

দুর্গাপূজা

দেবদুলাল চক্রবর্তী। উদয়পুর।

শরৎকালে দুর্গাপূজা, আমরা সবাই জানি;
শিউলী কাশে মেঘের ভেলায় দুর্গা মাকে আনি।
সঙ্গে আসেন গণেশ, লক্ষ্মী, কার্তিক, সরস্বতী
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ জীবনের গতি।
ষষ্ঠীতে বোধন, সপ্তমীতে পুজা
অষ্টমী নবমী ঝলমল, হাসেন দশভূজা।
মা বাবার হাত ধরে, মন্ডপে মন্ডপে যাই,
মুখরোচক নানান খাবার পেট পুরে খাই।
নতুন জামা নতুন জুতা পরে আমরা ঘুরি
পুজো দেখতে বাবা নিলেন ভাড়া একটি গাড়ি।
নবমী রাত শেষে দশমী যখন আসে
মনে হয় চারদিক বিষাদ সুর ভাসে!
মা ফিরে যান কৈলাশেতে ছেড়ে মোদের হাত
আগামীতে আবার এসো প্রার্থনা প্রণিপাত।
দশভূজা মায়ের কাছে মর্ত্যবাসীর কামনা,
সকলকে সুখে রেখো দুঃখ দিয়ো না।

যে মানুষটি হারিয়ে গেছে

জয়ন্ত মহাপাত্র। উড়িষা।

অন্ধকার ঘরে
এক নারী
আয়নায় তার প্রতিফলন খুঁজে পায় না

স্বভাবতই অপেক্ষায় থাকে
ঘুমের প্রান্তরে

তার হাতের মুঠোয়
তেলের প্রদীপ
মাতাল হলদে শিখা জানে
কোথায় তার নীরব শরীর
লুকিয়ে আছে

মূল কবিতা : A missing person.

তার হাতটি

ছোট মেয়েটির হাত আঁধার ঘেরা
আমি কি ভাবে ধরে রাখব হাতটি

কবন্ধের মত ঝুলে আছে ল্যাম্পপোস্ট
আর তার শরীর কাঁটার বিছানায় শুয়ে আছে

এই ছোট মেয়েটির শরীর এই মাত্র ধর্ষিতা হয়ে
আমার কাছে আসে

আমার অপরাধের ভার এতোটাই
মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরার প্রতিরোধ আর নেই

মূল কবিতা: Her hand.

অনুবাদ : রামেশ্বর ভট্টাচার্য। আগরতলা।

নেশার গ্রাসে আমাদের দেশ ও আমাদের ত্রিপুরা

সুব্রত মজুমদার। সিপাহীজলা।

কোন দেশ বা কোন রাজ্য যতদিন না সম্পূর্ণ ভাবে নেশার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হচ্ছে, সেই দেশ বা রাজ্য এবং জাতির পক্ষে প্রকৃত উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। নেশার ভয়ঙ্কর দিক অনুধাবন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮৯ সালের ২৬শে মজুন থেকে আন্তর্জাতিক নেশা বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করে। তারপর থেকে প্রতি বছর ২৬শে জুন দিবসটিকে নেশা বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। প্রাচীন ত্রিপুরায় শহর কেন্দ্রিক নেশাসক্ত কিছু নাগরিক কে দেখা গেলেও গ্রামকেন্দ্রিক ত্রিপুরাতে এর বারবরন্ত ছিল না। নেশা শুধু মাত্র ব্যক্তিকে নয় পুরো পরিবার কে ধ্বংস করে দেয়। বর্তমান আধুনিক ত্রিপুরায় আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নতি ঘটলেও, আধুনিক নেশা দ্রব্যের কবলে গ্রাস করে নিচ্ছে সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে। আধুনিক নেশা দ্রব্য যেমন হেরোইন, ব্রাওউন সুগার, নেশার ট্যাবলেট ইত্যাদি কে কিছু দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থে পেশা হিসাবে গ্রহন করেছে এবং মানসিক উন্নত সমাজ ঘটনে বাঁধা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এই ক্ষেত্রে কখনোও কখনোও সামাজিক দুর্বলতার কারনে আইনের বেড়াজাল এর ফঁশকে কুচক্রিরা বেরিয়ে যায়। এইখানে সমাজের বুদ্ধিজিবিরা নির্মূলকরন যেমন এগিয়ে আশা উচিত, পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রতিবেশীর বাড়ীতে যদি আগুন ধরে যায়, তার উত্তাপ আমার বাড়ীতেও আসতে পারে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে ভারতের ২৭২টি জেলা সর্বাধিক নেশায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। যদিও Narcotic bureau এই জেলাগুলোর উপর নজর রেখে চলেছে।

যুবক ও যুতীদের মধ্যে ড্রাগ এর প্রভাব

যুবক/যুবতীদের মধ্যে সাইকোঅ্যাকটিভ ড্রাগের অপব্যবহার একটি জাতীয় গুরত্বের বিষয়। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বাস্থ্যের অবনতি, অপরাধ বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে, সম্পর্ক নষ্ট করে, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায় এবং সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে প্রতিটি জাতির জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। তরুণরা মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের হুমকির সবচেয়ে বড় জিম্মি হয়ে উঠছে এবং তাদের দুর্বলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'মাদক পদার্থের অপব্যবহার' বলতে অ্যালকোহল এবং অবৈধ ঔষদ সহ সাইকোঅ্যাকটিভ পদার্থের ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক ব্যবহারকে বোঝায়। সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার করা অ্যালকোহল, গাঁজা(গাঁজা), ভাং, হাশিশ (চরস), বিভিন্ন ধরনের কাশির সিরাপ, সেডেটিভ ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগার, হেরোইন, কোকেন, তামাক (সিগারেট, গুটকা, পান মসলা) ইত্যাদি ড্রগ অপব্যবহার হিসাবেও পরিচিত। একটি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রস্তুতি বা একটি প্রাকৃতিকভাবে ঘটমান পদার্থ যা প্রথমিকভাবে একটি বিদ্যমান প্রক্রিয়া বা অবস্থার পরিবর্তন আনতে ব্যবহৃত হয় (শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক বা জৈব রাসায়নিক) যাহাকে একটি ড্রাগ বলা যেতে পারে। সহজ ভাষায়, যে কোনও একটি রাসায়নিক) যাহাকে একটি ড্রাগ বলা যেতে পারে। সহজ ভাষায়, যে কোনও একটি রাসায়নিক পদার্থ যা একজন ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক কার্যকারিতাকে পরিবর্তন করে তা হল একটি ড্রাগ। একটি ঔষধের চিকিৎসায় ব্যবহার থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে; এর ব্যবহার আইনি হতে পারে বা নাও হতে পারে। রোগ নিরাময়, রোগ প্রতিরোধ বা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ঔষুধের ব্যবহারকে 'ড্রাগ ব্যবহার' বলা হয়। কিন্তু যখন কোনো ঔষধ চিকিৎসা ব্যতীত অন্য কারণে, পরিমাণ, শক্তি, ফ্রিকোয়েন্সি বা পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয় যা একজন ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক কার্যকারিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন তা মাদক অপব্যবহার হয়ে যায়। চিকিৎসা ব্যবহারের সাথে ঔষধের সঠিক ভাবে ব্যবহার না করে অপব্যবহার এর মাধ্যমে কখনো কখনো নশা দ্রব্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। ব্রাউন সুগার এবং গাঁজার মতো অবৈধ ওষধের কোনো চিকিৎসায় ব্যবহার নেই। তাদের ব্যবহার করা হয় মাদক দ্রব্য হিসাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা ১৯৫৬ সালে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহারকে একটি মানুসিক রোগ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

কখনো কখনো পদার্থের অপব্যবহার সহনীলতা এবং নির্ভরতার বিকাশের সাথে সাথে পদার্থের প্রতি আসক্তির দিকে ধাবিত করে।

সহনশীলতা এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে ব্যবহারকারীর একই প্রভাব অনুভব করার জন্য আরও বেশি বেশি নেশ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। ধীরে ধীরে মাদক নির্ভরতা বিকশিত হয়। একজন মাদক ব্যবহারকারী নির্ভরশীল হওয়ার পরে , যদি হঠাৎ করে মাদক নেওয়া বন্ধ করে দেয়, তার শরীরবৃত্তীয় বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। প্রত্যাহারএর উপসর্গগুলি হালকা অস্বস্তি থেকে খিঁচুনি পর্যন্ত হতে পারে, মাদকের অপব্যবহারের ধরণের উপর নির্ভর করে। প্রত্যাহারের লক্ষণগুলির তীব্রতা ব্যবহারকারীর শারীরিক অবস্থা, মাদকের অপব্যবহারের ধরণ, মাদক গ্রহণের পরিমাণ এবং. নির্ভর করে। ঔষুধ প্রত্যাহারের লক্ষণগুলি সাধারণত শরীরে ঔষুধের উপস্থিতি দ্বারা উত্পাদিত প্রভাবগুলির বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাউন সুগার গ্রহণের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, যখন এর রত্যাহারের লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল ডায়রিয়া। ব্যবহারকারী এইভাবে ড্রাগ অপব্যবহার চালিয়ে যেতে বাধ্য হয় যদিও (বা যখন) সে জানে যে ড্রাগ তাকে আঘাত করছে।

মাদকের অপব্যবহার এবং মহিলাদের মধ্যে এর প্রভাব এখন ভারতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অপব্যবহারকারী পদার্থের কারণ ঃ

পদার্থের অপব্যবহারের কারণ ব্যক্তিভেদ ভিন্ন হতে পারে এবং একের অধিক কার এর জন্য দায়ী হতে পারে। পদার্থ অপব্যবহারের কারণগুলি নিম্নরূপ হতে পারে :

বিশ্বব্যাপী অ্যালকোহলের ক্ষতিকারক ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর ২.৫ মিলিয়ন মৃত্যু ঘটে। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী ৩২০,০০০ যুবক অ্যালকোহল-সম্পর্কিত কারণে মারা যায়, যার ফলে সেই বয়সেরসমস্ত মৃত্যুর ৯ শতাংশ হয়। কমপক্ষে ১৫.৩ মিলিয়ন ব্যক্তির মাদক সেবনের ব্যাধি রয়েছে। ১৪৮টি দেশ ইনজেকশন ড্রাগ ব্যবহারের রিপোর্ট করা হয়েছে, যার মধ্যে ১২০টি এই জনসংখ্যার মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের রিপোর্ট করেছে।

অল্পবয়সী যারা ক্রমাগত ভাবে পদার্থের অপব্যবহার করে তারা প্রায়শই একাডেমিক অসুবিধা, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সমস্যা (মানসিক স্বাস্থ্যসহ), দুর্বল সহকর্মী সম্পর্ক এবং সমগ্র সমাজের জন্য এর পরিণতি রয়েছে। পদার্থের অপব্যবহার/আসক্তির বিস্তৃত পরিণতিগুলি নিম্নলিখিত শিরোনামে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে -

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঃ

সাইকোঅ্যাকটিভ ড্রগগুলি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং একজন ব্যক্তির অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং আজরণ পরিবর্তন করে কাজ করে। তারা মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে (সিএনএস) সরাসরি প্রভাবিত করে কাজ করে যা বিভিন্ন জটিলতা এবং স্বাস্থ্য এবং আচরণগত সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। দুর্ঘটনার কারণে আঘাত (যেমন গাড়ি দুর্ঘটনা), শারীরিক অক্ষমতা এবং রোগ এবং সম্ভাব্য ওভারডোজের প্রভাবগুলি যুমক পদার্থের অপব্যবহারের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরিণতিগুলির মধ্যে রয়েছে।

এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ প্রাথমিকভাবে যৌন সংসর্গের সময় সংক্রামিত ব্যক্তির শরীরের তরলের সংস্পর্শে বা জীবাণুমুক্ত ড্রাগ-ইনজেকশন সরঞ্জাম ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে ঘটে। অনেক পদার্থ-অপব্যবহারকারী যুবক এমন আচরণে জড়িত যা তাদের এইচআইভি/এইডস বা অন্যান্য যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রাখে।

এইডস নির্ণয়ের হার বর্তমানে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম, অন্যান্য বয়সের গোষ্ঠীর তুলনায়। যাইহোক, যেহেতু এই রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার আগে দীর্ঘ বিলম্বিত সময় থাকে, তাই সম্ভবত এইডস-এ আক্রান্ত অনেক তরুণ বয়ঃসন্ধকালে এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছিল।

মানসিক স্বাস্থ্য ঃ

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন বিষন্নতা, বিকাশগত পিছিয়ে, উদাসীনতা, প্রত্যাহার এবং অন্যান্য মনোসামাজিক কর্মহীনতাগুলি প্রায়শই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পদার্থের অপব্যবহারের সাথে যুক্ত। বিষন্নতা সহ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির জন৺ অপব্যবারকারীদের তুলনায় মাদকদ্রব্য অপব্যবহারকারী যুবকরা বেশি ঝুকিতে রয়েছে; আচরণের সমস্যা, ব্যক্তিত্বের ব্যাধি, আত্মঘাতী চিন্তা, আত্মহত্যার চেষ্টা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।

সমবয়সীদের ঃ

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারকারী যুবকরা প্রায়শই তাদের সময়বয়সীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং কলঙ্কিত হয়। অ্যালকোহল এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী কিশোর-কিশোরীরাও প্রায়শই স্কুল এবং সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে সরে যায়, তাদের সহকর্মী এবং সম্প্রদায়গুলিকে তারা যে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে তা থেকে বঞ্চিত করে।

পরিবার ঃ

ব্যক্তিগত প্রতিকূলতা ছাড়াও, যুবকদের দ্বারা অ্যালকোহল এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ফলে পরিবারিক সংকট দেখা দিতে পারে এবং পারিবারিক জীবনের অনেক দিককে বিপন্ন করে তুলতে পারে, কখনও কখনও পারিবারিক কর্মহীনতার কারণ হতে পারে। ভাইবোন এবং বাবা-মা উভয়ই অ্যালকোহল এবং মাদকের সাথে

জড়িত যুবকদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার একটি পরিবারের আর্থিক এবং মানসিক সম্পদকে নিষ্কাশন করতে পারে।

হতাশা ঃ

মাদকাসক্তির অন্যতম প্রধান একটি কারণ হলো হতাশা। এই হতাশার কারণেই ব্যক্তি তার নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। যার ফলে সাময়িকভাবে আত্মমুক্তির জন্য সর্বনাশা মাদকাসক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

সঙ্গদোষ ঃ

মাদকাসক্তির জন্য সঙ্গদোষ আরেকটি মারাত্মক কারণ। নেশাগ্রস্ত বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে এটি বিস্তার লাভ করে।

কৌতূহল ঃ

কৌতূহলও মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ। অনেকেই মাদকাসক্তির ভয়াবহতা জেনেও কৌতূহলবশত মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে।

সহজ আনন্দ লাভের বাসনা ঃ

অনেক সময় মানুষ মাদককে আনন্দ লাভের সহজ উপায় হিসেবে মাদক গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

মনস্তাত্বিক বিশৃঙ্খলা ঃ

তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের জন্য এটি অন্যতম কারণ। পরীক্ষায় ফেল, পারিবারিক কহল, প্রেমে ব্যর্থতা, বেকারত্ব ইত্যাদি কারণে তারা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি ঃ

পদার্থ ব্যবহারকারী অনেক পরিবারও পরিবারের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাতে অসুবিধার পড়েছিল, কারণ উপলব্ধ সংস্থানগুলি মৌলিক প্রয়োজনের পরিবর্তে পদার্থের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। এটি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর একটি দুর্দান্ত মানসিক প্রভাব ফেলে। যুবক পদার্থ অপব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক খরচ বেশি। এগুলি অ্যালকোহল-এবং মাদক-সম্পর্কিত অপরাধের শিকারদের দ্বারা ভোগা আর্থিক ক্ষতি এবং দুর্দশার ফলে, কিশোর-কিশোরীদের এবং অল্পবয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের সহায়তার জন্য বোঝা বৃদ্ধি পায় যারা স্ব-সমর্থক হতে পারছে না এবং এই যুবকদের জন্য চিকিৎসা ও অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আরও বেশি চাহিদা।

অপরাধ ঃ

পদার্থের অপব্যবহার এবং অপরাধের মধ্যে একটি অনস্বীকার্য লিঙ্ক রয়েছে। অ্যালকোহল এবং অন্যান্য মাদক সেবনে নিযুক্ত অনেক যুবকের জন্য কিশোর বিচার ব্যবস্থার দ্বারা প্রেপ্তার, বিচার এবং হস্তক্ষেপ চূড়ান্ত পরিণতি। এটা দাবি করা যায় না যে পদার্থের অপব্যবহার যুবকদের দ্বারা সহিংস এবং আয়বর্ধন উভয় অপরাধের সাথে জড়িত। গ্যাং, মাদক পাচার, পতিতাবৃত্তি এবং যুব হত্যার ক্রমবর্ধমান সংখফ্যা সামাজিক এবং ফৌজদারি বিচার সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে যা প্রায়শই কিশের-কিশোরী পদার্থের অপব্যবহারের সাথে যুক্ত।

কাজের জায়গা ঃ

কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, অনেক পদার্থ ব্যবহারকারী কাজ করতে যাওয়া মিস করেছিল, প্রায়শই সহকর্মী এবং বন্ধুদের কাছ থেকে অর্থ ধার করেছিল, দুর্বল উৎপাদকশীলতা দেখিয়েছিল এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সম্মানের আভবের মুখোমুখি হয়েছিল।

মাদকাসক্তির কুফল ঃ

মাদকাসক্তি একধরনের মরণ নেশা। মৃত্যুই তার একমাত্র গন্তব্যস্থল। মাদকগ্রহণ ধীরে ধীরে স্নায়ুকে দুর্বল করে তোলে। শরীরের রোগ - প্রতিরোধ ক্ষমতা আস্তে আস্তে নিঃশেষ করে দেয়। তাছাড়া ক্ষুধা ও যৌন অনুভূতি হ্রাস ঘটায়। মাদক গ্রহণে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। হৃদস্পন্দন দ্রুত হয় এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। রাগান্বিতভাব, নিদ্রহীনতা, উগ্র মেজাজ, ওজন হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা-যায়। মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ফলে স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতায় ক্ষতিকর প্রভাবসহ মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া ইনজেকশনর মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করলে এইচআইভি হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশি। এককথায় মাদকাসক্ত মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

উপসংহার ঃ-

আমরা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে সমাজে মাদকদ্রব্যের অপব্যহারের পরিণতি সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে যুবকদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত নেতিবাচক যা অবিলম্বে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। সকল স্টেকহোল্ডারের সহযোগিতামূলক প্রচেপ্রয়োজন, একা কেউ এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কঠোর আইন ও প্রখর নজরদারি ছাড়া এইসব অসাধু ব্যবসায়ীদের লোভ সংযত করা সম্ভ নয়। প্রয়োজনে ড্রাগে আসক্ত মানুষকে সংশোধন কেন্দ্রে রেখে যথাযথ চিকিৎসা করাতে হবে। সামাজিকভাবে ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলনও সংগঠিত করা প্রয়োজন। তবে কেবল সরকার নয়, বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীদেরও অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। এভাবেই একমাত্র রুখে দেওয়া সম্ভব নেশার জালবিস্তার।

পথভ্রষ্ট নতুন প্রজন্মে মারণ ব্যাধির আক্রমন ও উত্তোরনের পথ

ডাঃ কমল রিয়াং। উদয়পুর।

নতুন প্রজন্ম পথভ্রষ্ট? ওরা কী Real meaning of life থেকে সরে যাচ্ছে? অনিশ্চিত, দিশাহীন জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছে? অর্থ আর ক্ষমতার পেছন পেছন ছুটে কী ওরা সুখ-শান্তি খুঁজতে চাইছে? বৈষয়িক চাওয়া পাওয়াতেই কী জীবন? ক্ষণস্থায়ী সুখ, আনন্দ খুঁজতে গিয়ে সবাই ছুটছেন, ছুটছে নতুন প্রজন্ম। আর এভাবে ছুটতে ছুটতে ওরা জুড়েযাচ্ছে প্রতিযোগিতায়। যে প্রতিযোগিতায় রয়েছে হিংসা, ঈর্ষা, দুর্নীতি ইত্যাদি। আর সর্বোপরি নেশা। অমিতাভ বচ্চনের সেই গান মনে পরে — "নেশে মে কোন নেহি হে .....।" বস্তুত আমরা সবাই একটা না একটা নেশাতে আছি। তা সুখের নেশাও হতে পারে আবার দুঃখেরও হতে পারে।

নেশার শিকড় সেই সৃষ্টির আদি থেকেই ছড়িয়ে রয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই নেশা আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে। তামাক, পান, জর্দা থেকে শুরু করে আজকের হেরোইন পর্যন্ত। বাবার নেশা সিগারেট। আর ছেলে নেশা হেরোইন। শুধু আইটেম আলাদা। বাবা শুরু করেন সাইকেল, Keypad mobile দিয়ে। আর ছেলের শুরু হয় বাইক Android দিয়ে। আমি যুব সমাজকে শুধুমাত্র নেশার জন্যে দায়ী করছি না। কারণ নেশার প্রতি interest তো আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া।

আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। শুধু ভাত খেয়েই বাঁচিনা। আমদের শারীরিক এবং মানসিক well being-ও লাগে। এই Feeling good করতে গিয়েই আমরা অনেক সময় নেশার দিকে ধাবিত হই। দুঃখে বা সুখে আমাদের নেশা বা stimulus চাই। আবার কখনও Strain and strees থেকেও আমরা নেশাকে সঙ্গী করে থাকি। আমাদের হাতের কাছে সস্তা বা দামী নানা নেশাসামগ্রী ছড়িয়ে রয়েছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে Experimental হিসাবে সঙ্গীর পাল্লায় পড়েও নেশাতে জড়িয়ে পড়ছে নতুন প্রজন্ম।

আজকাল তামাক জাতীয় নেশা থেকে তরুন প্রজন্ম বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে Drugs এর দিকেই। তাতে দ্রুত নেশা বা Kick পাওয়া যায়। আর এতেই যত বিপত্তি। এন সিরিজ দিয়ে একসঙ্গে অনেকজন Drugs নেয়ার ফলে ছড়াচ্ছে Hepatitis-B,C HIV মত মারণ Virus। যার ফলে সারা জীবন রোগ ভোগের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। সম্প্রতি একটিপরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছেঃ-

	Tripura	India	North-East
	(%)	(%)	(%)
Smokers	27.3	14.0	19.3
Smokerless	41.4	25.9	34.6

এককথায় নেশাতে সারা দেশে ত্রিপুরা রয়েছে প্রথম সারিতে আছে।

কথায় বলে Charity begins at home. ঘর থেকেই শুরুটা করতে হবে। মা বাবাকেও নেশা ছাড়তে হবে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাই।' ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। বাড়ীতে যাতে সেই পরিবেশ বজায় থাকে। ছেলে মেয়েদের বয়:সন্ধিকালীন সময়ে মা বাবারা সেদিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। গান্ধীজী বলেছেন আধ্যাত্মিক শিক্ষা না থাকলে সব শিক্ষাই বৃথা। তবে নতুন প্রজন্মের নেশাবিহীন জীবন তৈরীতে শুধু মাত্র পরিবার পাশে থাকলেই চলবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্লাব, পুলিশ, রি-হ্যাব সেন্টার, সমাজ কল্যান দপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্য দপ্তরকেও আন্তারিক ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

নিজের জীবনের একটি গল্প বলে কথা শেষ করছি। তখন আমি গ্রামের স্কুলে দশম শ্রেনীতে পড়তাম। বন্ধুদের অনেকেই খৈনি জাতীয় নেশায় আসক্ত ছিল। ওরা আমাকে বোঝাতো এই নেশা নিলে নাকি দাঁত ভাল থাকে? ওদের কথায় নেওয়া শুরু করলাম। একদিন আমার মেজদা দেখে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন মুখে কি দিলাম? বললাম দাঁত ভাল রাখার জন্য খৈনি নিয়েছি। শুনেই তিনি আমাকে খুব বকাঝকা করলেন। যুক্তি দিয়ে বোঝালেন এই জাতীয় নেশায় চোখ খারাপ হতে পারে। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত কোনদিন আমি সেই নেশার বস্তুতে হাত দেইনি। মনে মনে এখনো আমার প্রয়াত দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কারণ উনি আমার নেশামুক্ত জীবন গঠনে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

ডাঃ দেবাশীষ দাস। সিপাহীজলা।

"পাবলিক হেলথ ক্রয়যোগ্য। কয়েকটি প্রাকৃতিক এবং মৌলিক সীমার মধ্যে, একটি সম্প্রদায় তার নিজস্ব স্বাস্থ্য অবস্থা নির্ধারণ করতে পারে।"

- হেভেন এমারসন।

পাবলিক হেলথ সমাজের সুস্থতার মূল ভিত্তি। যা বিভিন্ন ভৌগোলিক এবং জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য বিস্তৃত সেবা প্রদান করে। পাবলিক হেলথের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, কারণ এটি সংগঠিত সমাজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ, জীবনকে দীর্ঘায়িত এবং স্বাস্থ্য উন্নীত করার লক্ষ্য রাখে। প্রতিটি সম্প্রদায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত কারণ দ্বারা প্রভাবিত একক চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ প্রদান করে। তাই, পাবলিক হেলথ সেবা প্রদানের প্রতিটি বাধাকে বোঝা এবং সমাধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য কৌশলগুলি তৈরি করার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যসেবার সমতা নিশ্চিত করতে, স্বাস্থ্য বৈষম্য হ্রাস করতে এবং একটি স্বাস্থ্যকর, আরও স্থিতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য নেওয়া মূল কৌশলগুলির মধ্যে একটি হল স্বাস্থ্যসেবায় পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির (পি.আর.আই) পরিচিতি। পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠশনগুলি (পি.আর.আই) ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলের বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক কাঠামো, যা শাসনকে তৃণমূলের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলি গ্রাম, মধ্যবর্তী এবং জেলা স্তরে নির্বাচিত সংস্থা নিয়ে গঠিত: যথাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় স্ব-শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখে, গ্রামীণ সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব উন্নয়নের বিষয়ে অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে।

পি.আর.আই সংস্থাগুলি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে, স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাতে তা সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণ করে। তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ক্লিনিক এবং স্যানিটেশন সুবিধাগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর করে। পরিষ্কার পানীয় জল নিশ্চিত করে এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করে। এছাড়াও, পি.আর.আই সংস্থাগুলি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং সংক্রামক রোগগুলির উপর স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারাভিযান পরিচালনা করে এবং ঘাটতি পূরণ করে। রাজ্য এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগগুলির সাথে সমন্বয় করে পি.আর.আই সংস্থাগুলি স্বাস্থ্য নীতিমালা এবং ঘাটতি পূরণ করে। রাজ্য এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগগুলির সাথে সমন্বয় করে, পি.আর.আই সংস্থাগুলি স্বাস্থ্য নীতিমালা এবং কর্মসূচির নিবিঘ্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ডেটা সংগ্রহ ও প্রচার সহজতর করে, এভাবে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো ও পরিষেবাগুলির উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পঞ্চায়েতি রাজের ধারণাটি ১৯৯২ সালের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক করা হয়, যা সারা ভারতে পি.আর.আই সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠার বাধ্যতামূলক করে। এই আইনটি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য নিয়ে এবং স্থানীয় কমসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে একটি বৃহত্তর ভূমিকা প্রদানের জন্য ছিল, যার মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা অন্তভুর্ক্ত। রোগী কল্যাণ সমিতি (আর.কে.এস) এবং জন আরোগ্য সমিতি (জে.এ.এস) এর মতো কমিটিগুলিতে পি.আর.আই সংস্থাগুলির অন্তর্ভুক্তি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার স্বায়ত্তশাসন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। এই প্রতিনিধিত্বটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট চাহিদাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুবিধার স্তরে হস্তক্ষেপগুলিকে সামঞ্জস্য করত দেয়।

PRI সংস্থাগুলিস্বাস্থ্য সেবায় একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে স্থানীয়করণকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে, নিশ্চিত করে যে স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলি প্রতিটি সম্প্রদায়ের অনন্য চাহিদাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা স্বাস্থ্য

উদ্যোগগুলিতে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে, যা এই কর্মসূচিগুলির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। এছাড়াও, স্থানীয় শাসন কাঠামোগুলি যাদের তারা পরিবেশন করে তাদের কাছে আরও বেশি দায়বদ্ধ, যা স্বাস্থ্য সম্পদের আরও ভাল ব্যবস্থাপনা এবং বরাদ্দের দিকে নিয়ে যায়। PRI সংস্থাগুলির জড়িত হওয়া বিশেষ করে দূরবর্তী এবং অবহেলিত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা-গুলির প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। তারা স্বাস্থ্য উদ্যোগগুলির জন্য স্থানীয় সম্পদ এবং তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে, এভাবে স্বাস্থ্য কর্মসূচীর সামগ্রিক কার্যকারিতা বাড়ায়। কর্মক্ষমতা ভিত্তিক প্রণোদনা চালু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থাগুলিকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ত্রিপুরা তার কার্যকারিতা বাড়ায়। PRI সংস্থাগুলির দ্বারা সহজতর স্থানীয় পর্যবেক্ষন আরও দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নেতৃত্ব দেয় এবং সম্প্রদায়গুলিকে তাদের স্বাস্থ্যচাহিদাগুলি পরিচালনার ক্ষমতায়নে চূড়ান্তভাবে

সিপাহিজলায় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কার্যক্রমে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ।

নিজেদের গৃহস্থালীর ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে পুরো নির্বাচনী এলাকার প্রতি পরিবারের মতো যত্ন নেওয়া পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান (PRI) সদস্যরা সম্প্রদায়ের প্রকৃত "কণ্ঠস্বর" হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিঃশব্দে থাকা ব্যথা ও চ্যালেঞ্জগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং নিশ্চিত করেন যে স্বাস্থসেবা সবার জন্য সহজলভ্য হয়। তাদের অঙ্গীকার শুধুমাত্র জনস্বার্থের পক্ষে কথা বলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, তারা স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন ও ক্ষমতায়ন করেন, যাতে তারা তাদের দক্ষতা ও সেবা সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রদান করতে পারেন। এই সহানুভূতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে, সদস্যরা নিরাময়কে উৎসাহিত করতে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকারের নিশ্চিয়তা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে, PRI সংস্থাগুলির তার জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি ধরে রেখেছে। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উপর মনোনিবেশ করে তারা নিশ্চিত করতে পারে যে কোনও মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে তার জীবন হারাবে না এবং কোনও শিশুকে স্বাস্থ্যকর শুরু থেকে বঞ্চিত করা হবে না। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা এবং এইচ আই ভির মতো সংক্রামক রোগগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নিবেদিত প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে তারা ত্রিপুরার ভবিষ্যতকে পুষ্ট করতে পারে। স্যানিটেশন সুবিধাগুলি উন্নত করতে এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনগুলি প্রচার করার উদ্যোগগুলি সবার জন্য একটি পরিষ্কার, স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় সম্প্রদায়ের গভীরভাবে সম্পৃক্ত করা, PRI সদস্যদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং উন্নত স্বাস্থ্য ফলাফল অর্জনের দিকে পরিচালিত

করে। PRI সংস্থাগুলিকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ত্রিপুরা তার গ্রামীণ জনসংখ্যাকে উন্নীত করতে পারে, স্বাস্থ্যকে একটি ভাগ করা দায়িত্ব এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য আশার বাতিঘর করে তুলতে পারে।

পল ফার্মার বলেছেন - "স্থানীয় সমাধানগুলি স্বাস্থ্যসেবায় বৈশ্বিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।" PRI সংস্থাগুলি একে একে শক্তিশালী স্তম্ভগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে যা সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার ভিত্তি স্থাপন করে, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গতি ত্বরান্বিত করছে। সম্প্রদায়ের সম্পদগুলিকে একীভূত করতে এবং সেগুলিকে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" অর্জনের লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে PRI সংস্থাগুলির আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ, উদ্ভাবন এবং প্রাণবন্ততা - উন্নত জীবনের জন্য উৎসাহিত করছে।

Present Scenario of drugs addiction-An overview

Shri Subrata Das. Agartala.

Drugs include-

* All medicines for internal or external use of human beings or animals and all substances intended to be used for or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human beings or animals.
* Substances other than food products which alter the structure of human body or helps in the destruction of insects or vermin that cause the diseases.
* Substances intended to be used as components of drug including empty gelatin capsule etc.
* Devices which are intended for the purpose of internal or external use in diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease or disorder in human beings or animals.

Drug addiction is a chronic brain disease. It causes a person to take drugs repeatedly, despite the harm they cause. Repeated drug use can change the brain and lead to addiction. The brain changes from addiction can be lasting, so drug addiction is considered a "relapsing" disease. This means that people in recovery are at risk for taking drugs again, even after years of not taking them. Drug addiction has spread throughout the world, and young people in particular are becoming dependent on various narcotics and stimulants that have narcotic effects. Addict's persons lose touch with their family, which spoils their life in every way. They spend a lot of money on drugs before looking for criminal ways to make money. There are many harmful drug side effects, especially when we compare them to health issues. Due to the fact that drug consumption is such a big issue in today's culture, drug addiction among young people is on the rise in Tripura. The source claims that young people between the ages of 18 and 30 are addicted to substances like charas, Ganja, as well as dendrite, Codeine phosphate containing drugs, heroin, yava, and many other addiction inducing pills. The majority of those impacted by drug use are students in schools and colleges. Drugs use can harm the brain and body, sometimes permanently. It can hurt the people around anybody, including friends, families, kids, and unborn babies. Drug use can also lead to addiction.

Few years back most of youth and students like to use Codeine Phosphate containing drugs, Spasmoproxyvon capsules and other sedative drugs for addiction in Tripura but recently the use of said substance has decreased a lot. Recently the Students and youth of Tripura are using heroine mostly which is available in small pouch packets and kotta. The source claim that heroine are used intravenous route only by mixing with the blood collected from one person and then pushed to the several persons through 1ml/2ml single syringes for which chance of spreading the diseases like HIV, HBsAg, HCV and other blood transfused diseases from one person to another. To control the severe situation Government of Tripura has taken lot of initiative including procurement of such drugs by blacker and also to control the sale of 1ml/2ml syringes from the drugs shop to the public without prescription and sales record. Accordingly drugs control administration; Government of Tripura has taken initiative & mostly controlled the sale of syringe by the drugs shop without prescription and memos. Inspecting Officer (Drugs) of Tripura is also looking a strict vigil regarding sale of 1ml/2ml syringes by the drugs shop keeper without prescription of Registered Medical Prescription. But it is a great challenge to control the procurement of the syringes through online by addict peoples. It is also cannot be ignore that if there is shortage of supply of syringe then the addict personal will bound to use single syringe for multiple person and then change to spread the blood transfusion diseases may be more but vice versa if there is 2

availability of syringes in market without control than it will be easy for the addict person to use the drugs easily like heroine through syringe.

Illegal substances mostly used for drugs addiction are such as

* Anabolic steroids
* Club drugs
* Cocaine
* Heroin
* Inhalants
* Marijuana
* Methamphetamines
* Misusing prescription medicines, including opioids. This means taking the medicines in a different way than the health care provider prescribed. This includes taking a medicine that was prescribed for someone else
* Taking a larger dose than you are supposed to take like consumption of 100 ml of codeine phosphate containing syrup at a time.
* Using the medicine in a different way than you are supposed to take. For example, instead of swallowing your tablets, you might crush and then snort or inject them.
* Using the medicine for another purpose.
* Misusing over-the-counter medicines, including using them for another purpose and using them in a different way than you are supposed to use it.

<u>Various risk factors for drug addiction</u>

Various risk factors can make you more likely to become addicted to drugs including:

* Personal behavior:- People can react to drugs differently. Some people like the feeling the first time they try a drug and want more. Others hate how it feels and never try it again.

Mental health Issue:- People who have untreated mental health problems, such as depression, anxiety, or attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) are more likely to become addicted. This can happen because drug use and mental health problems affect the same parts of the brain. Also, people with these problems may use drugs to try to feel better.

Family issue: - If home is an unhappy place or was when anyone was growing up, anyone might be more likely to have a drug problem.

Problem in school, at work, or with making friends:-. Anyone might use drugs to get your mind off these problems.

Hanging around other people who use drugs:- Some people might encourage anyone to try drugs..

Peer Pressure:-. Now the life is extremely competitive, and it is challenging to advance in one of these environments. Both young and old people, but particularly young people, are always under peer pressure. For this reason, many young people anticipate feeling pressured to try drugs, smoke, or consume alcohol..

Environmental factor:-Another reason for young people to hook to drugs is exposure to drug usage in the environment in which they are raised. If a person grows up around drug use among adults, they are more inclined to experiment with drugs on their own. A person who uses drugs for the first time frequently receives recommendations from friends, coworkers, and elders..

Substance use disorder:-. Drug addiction, also called substance use disorder, is a disease that affects a person's brain and behavior and leads to an inability to control the use of a legal or illegal drug or medicine. Substances such as alcohol, marijuana and nicotine also are considered drugs. Experimental factor:-Drug addiction can start with experimental use of a recreational drug in social situations, and, for some people, the drug use becomes more frequent. For others, particularly with opioids, drug addiction begins when they take prescribed medicines or receive them from others who have prescriptions. Nature of Drugs:- The risk of addiction and how fast you become addicted varies by drug. Some drugs, such as opioid painkillers, have a higher risk and cause addiction more quickly than others. Drug Tolerance:-As time passes, you may need larger doses of the drug to get high. Soon you may need the drug just to feel good. As your drug use increases, you may find that it's increasingly difficult to go without the drug. Attempts to stop drug use may cause intense cravings and make

you feel physically ill. These are called withdrawal symptoms.
Physical , Mental & behavioral Sign of drug addiction:-
Spending a lot of time alone
Losing interest in favorite things
Not taking care of themselves - for example, not taking showers, changing clothes, or brushing their teeth
Being really tired and sad
Eating more or eating less than usual
Being very energetic, talking fast, or saying things that don't make sense
Being in a bad mood
Quickly changing between feeling bad and feeling good
Sleeping at strange hours
Having problems in personal or family relationships Continuing to use the drug, even though you know it's causing problems in your life or causing you physical or psychological harm Doing things to get the drug that you normally wouldn't do, such as stealing Driving or doing other risky activities when anyone under the influence of the drug Spending a good deal of time getting the drug, using the drug or recovering from the effects of the drug Failing in your attempts to stop using the drug Experiencing withdrawal symptoms when anyone attempt to stop taking the drug Frequently missing school or work, a sudden disinterest in school activities or work, or a drop in grades or work performance Lack of energy and motivation, weight loss or gain, or red eyes Lack of interest in clothing, grooming or looks Sudden requests for money without a reasonable explanation; or your discovery that money is missing or has been stolen or that items have disappeared from your home, indicating maybe they're being sold to support drug use. Complications:- Signs and symptoms of drug use or intoxication may vary, depending on the type of drug but most common for using drugs like Marijuana, hashish and other cannabis-containing substances, Barbiturates, benzodiazepines and hypnotics, Meth, cocaine and other stimulants, Club drugs, Hallucinogens, Inhalants and Opioid painkillers includes, among others, heroin, morphine, codeine, methadone, fentanyl and oxycodone. Methamphetamine, opiates and cocaine are highly addictive and cause multiple short-term and long-term health consequences, including psychotic behavior, seizures or death due to overdose. Opioid drugs affect the part of the brain that controls breathing, and overdose can result in death. Taking opioids with alcohol increases this risk.
4
GHB and flunitrazepam may cause sedation, confusion and memory loss. These so-called "date rape drugs" are known to impair the ability to resist unwanted contact and recollection of the event. At high doses, they can cause seizures, coma and death. The danger increases when these drugs are taken with alcohol. MDMA also known as molly or ecstasy can interfere with the body's ability to regulate temperature. A severe spike in body temperature can result in liver, kidney or heart failure and death. Other complications can include severe dehydration, leading to seizures. Long-term, MDMA can damage the brain. One particular danger of club drugs is that the liquid, pill or powder forms of these drugs available on the street often contain unknown substances that can be harmful, including other illegally manufactured or pharmaceutical drugs. Due to the toxic nature of inhalants, users may develop brain damage of different levels of severity. Sudden death can occur even after a single exposure. Other life-changing complications Dependence on drugs can create a number of dangerous and damaging complications, including:- Infectious disease.- People who are addicted to a drug are more likely to get an infectious disease, such as HIV, either through unsafe sex or by sharing needles with others. Other health problems: - Drug addiction can lead to a range of both short-term and long-term mental and physical health problems. These depend on what drug is taken. Accidents. -People who are addicted to drugs are more likely to drive or do other dangerous activities while under the influence. Suicide: - People who are addicted to drugs die by suicide more often than people who aren't addicted. Family prob

lems: - Behavioral changes may cause relationship or family conflict and custody issues. Work issues: - Drug use can cause declining performance at work, absenteeism and eventual loss of employment. Problems at school: - Drug use can negatively affect academic performance and motivation to excel in school. Legal issues: - Legal problems are common for drug users and can stem from buying or possessing illegal drugs, stealing to support the drug addiction, driving while under the influence of drugs or alcohol, or disputes over child custody. Financial problems: - Spending money to support drug use takes away money from other needs, could lead to debt, and can lead to illegal or unethical behaviors.

5

Initiatives for recovery from drug addiction

Treatments for drug addiction include counseling, medicines, or both. Research shows that combining medicines with counseling gives most people the best chance of success. The counseling may be individual, family, and/or group therapy. It can help:

Understand why anyone got addicted

See how drugs changed behavior

Learn how to deal with all problems so anyone won't go back to using drugs

Learn to avoid places, people, and situations where anyone might be tempted to use drugs

Medicines can help with the symptoms of withdrawal. For addiction to certain drugs, there are also medicines that can help re-establish normal brain function and decrease cravings. If anybody has a mental disorder along with an addiction, it is known as a dual diagnosis. It is important to treat both problems. This will increase the chance of success. If anyone has a severe addiction then may need hospital-based or residential treatment. Residential treatment programs combine housing and treatment services.

Symptoms to seek emergency help Seek emergency help if someone has taken a drug and: May have overdosed Shows changes in consciousness Has trouble breathing Has seizures or convulsions Has signs of a possible heart attack, such as chest pain or pressure Has any other troublesome physical or psychological reaction to use of the drug Principles of effective drug addiction treatment These 13 principles of effective drug addiction treatment were developed based on three decades of scientific research. Research shows that treatment can help drug-addicted individuals stop drug use, avoid relapse and successfully recover their lives. 1. Addiction is a complex, but treatable, disease that affects brain function and behavior. 2. No single treatment is appropriate for everyone. 3. Treatment needs to be readily available. 4. Effective treatment attends to multiple needs of the individual, not just his or her drug abuse. 5. Remaining in treatment for an adequate period of time is critical. 6. Counseling— individual and/or group —and other behavioral therapies are the most commonly used forms of drug abuse treatment. 7. Medications are an important element of treatment for many patients, especially when combined with counseling and other behavioral therapies. 8. An individual's treatment and services plan must be assessed continually and modified as necessary to ensure it meets his or her changing needs. 9. Many drug-addicted individuals also have other mental disorders. 10. Medically assisted detoxification is only the first stage of addiction treatment and by itself does little to change long-term drug abuse. 11. Treatment does not need to be voluntary to be effective. 12. Drug use during treatment must be monitored continuously, as lapses during treatment do occur. 13. Treatment programs should assess patients for the presence of HIV/AIDS, hepatitis B and C, tuberculosis and other infectious diseases, as well as provide targeted risk-reduction counseling to help patients modify or change behaviors that place them at risk of contracting or spreading infectious diseases.

6

Some suggestions to help a friend or family for recovery: Learn all that anybody can about alcohol and drug dependence and addiction. Speak up and offer your support. Talk to the

person about your concerns, and offer your help and support, including your willingness to go with them and get help. Like other chronic diseases, the earlier addiction is treated, the better. Express love and concern. Focus the conversation on specific behaviros and avoid name-calling, which may cause the person to shut down. Do not expect the person to change without help. Treatment, support, and new coping skills are needed to overcome addiction. Support recovery as an ongoing process: once your friend or family member is receiving treatment, or going to meetings, remain involved. The goal is to let them know you care and are available when they need someone in their corner. Some things to avoid: Avoid lectures, threats, bribes, or emotional appeals, which can worsen shame and lead to isolation or the compulsion to use. Do not cover up, lie or make excuses for their behavior; open and honest communication is vital for people with SUD to get the help they deserve. Avoid confrontations with someone who is intoxicated; they will likely not be able to have a meaningful or rational conversation and could escalate to violence. Do your best to not feel guilty for their behavior; people with substance use disorder are suffering from an illness and, like other forms of disease; it is not caused by any one person or action. Do not join them; drinking or using alongside someone with SUD will harm not only them but also you.

REFERENCES:- 1. National Council on Alcoholism and Drug Dependence and One Love Foundation's "How to Talk to a Friend." 2. National Institute on Drug Abuse. These principles are detailed in NIDA's Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide. 3. Drug Addiction: A Reflection on Youths of Tripura * Dr. Madhumita Debnath, PGT, Henry Derozio School, Agartala & ** Prof. Chandrika Basu Majumder, Dept. of Political Science, Tripura University. 4. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-addiction/symptoms-causes/syc-20365112 5. https://nida.nih.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drug-misuse-addiction

এই সময় ও আমরা

পার্থপ্রতিম সাহা। উদয়পুর।

এবারের বন্যা রাজ্যবাসীকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনেকাংশেই মিলে গেছে। গোমতী জেলা ও দক্ষিণ জেলার বহু মানুষ বন্যার ফলে বাড়ি ছেড়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন । মৃত্যু হয়েছে কয়েক জনের। যদি সাড়া রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে এক বছরে রাজ্যের যা বাজেট প্রায় তার সমান ক্ষতি হয়ে গেছে। ত্রিপুরার মত একটি ছোট রাজ্যের পক্ষে এই ক্ষতি মোকাবেলা সম্ভব নয়। উদয়পুর শহরে জল জমার অন্যতম কারন প্লাস্টিকের বোতল, পলিব্যাগ, ড্রেনকে ডাস্টবিনে পরিণত করা এবং অবৈজ্ঞানিক জল নিকাশি ব্যবস্থা। কিন্তু উদয়পুরের পৌর পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বিশাল টীম দিনরাত কাজ করে শহরবাসীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। আবার দেখা গেছে বন্যার ফলে পানীয় জলের হাহাকার। বন্যাকবলিত এলকার সর্বত্রই দুর্গতরা চাইছেন জল। চরম দুর্দিনে ওদের জন্য সামান্য হলেও হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার সৈনিকরা ছুটে গেছেন পানীয় জল নিয়ে। বন্যা কতটা বিপদ ডেকে আনে, জীবনে বাঁচা মরার বিপদ ডেকে আনে জীবনে বাঁচা মরার অন্যতম শর্তটিকে প্রবলভাবে দূষিত করতে পারে কিংবা দুমড়ে মুচড়ে জলের উৎসকে নিশ্চিহ্নও করে দিতে পারে এবছরের বন্যা তা দেখিয়ে গেছে আমাদের। এই সময় পানীয় জলের চাহিদা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই হয়। রাজ্যের বন্যাকবলিত এলাকার প্রায় সিংহভাগ পানীয় জলের উৎস সঙ্গে বিদ্যুৎ পরিষেবাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমাদের সংগঠনের প্রাণপুরুষ প্রফেসার ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক স্যার নিজে যেমন ছুটে গেছেন দুর্গতদের পাশে। তেমনি সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন বন্যায় দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য। সেই নির্দেশ মতো সারা রাজ্যের কর্মীরা বন্যার্তদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। খয়েরপুরে ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক স্যারের নেতৃত্বে মেডিকেল টীম গেছে বন্যায়দুগর্তের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। উদয়পুরে গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং এর হাতে মহিলা ও মায়েদের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। তেমনি টেপানিয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমতি দেবশ্রী দাশগুপ্তের. হাতেও অনুরূপ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। আগরতলায় সংগঠনের পক্ষ থেকে খাদ্য বস্ত্রসহ বেশ কিছু সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে বন্যায় দুর্গতদের জন্য। অনুরূপভাবে গোমতী জেলার করবুক মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় কাপড়। অমরপুর মহকুমার বন্যাকবলিত দেববাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নমঃপাড়াসহ পার্শ্ববর্তী পাড়াগুলোতে মা-বোনেদের মধ্যে শাড়ী, পুরুষ ও বাচ্চাদের জন্য কিছু সামগ্রী হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের সদস্য/সদস্যারা গোমতী জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রাণময় সাহার উপস্থিতিতে বিতরণ করেন। আগামী দিনেও সংগঠন মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সঙ্গ নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। শারদ সম্মান ও স্মরণিকা 'উন্মেষ' প্রকাশে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমরা হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার উদয়পুর শাখা ও সাউথ জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আশা রাখছি আগামী দিনেও সবার সহযোগিতায় হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা মানুষের জন্য সেবাভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাবে।

আগামীর কর্মপথ

ডাঃ অভিজিৎ দত্ত। উদয়পুর।

সম্প্রতি যে কঠিন জলমগ্ন সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি তা আমাদের অনেকগুলো পাঠ দিয়ে গেছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা উপলব্ধি করেছে বন্যার ভয়াবহতা। ওরা জেনেছে এই কঠিন সময়ে কীভাবে যূথবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। জেনেছে আর্তমানুষের পাশে কেমন ভাবে দাঁড়াতে হয়। খাদ্য, পানীয় জল, পোষাক সর্বোপরি রোজ দিনের জীবন জলের স্রোতে কেমন করে পাল্টে যায় সেই উপলব্ধি ওদের হয়েছে। শুধু নতুন প্রজন্ম কেন যুবক বা প্রবীন সবার জীবনই একটু হলেও ভিন্ন খাতে বইয়ে দিয়েছে উন্মত্ত জলস্রোত। বন্যা থেমে গেলেও জলের দাগ, ক্ষতচিহ্ন লেপ্টে রয়েছে আমাদের জীবনে। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন যে সেবাব্রতের ভাবনা নিয়ে বিগত দিনগুলোতে কাজ করে এসেছে আগামীতেও তা করে যাবে। তাই চলতি দুঃসময়ে মানুষকে সামান্য হলেও স্বস্তি দিতে কিছু করার ইচ্ছা আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে। যিনি আমাদের সেই ইচ্ছাকে প্রকৃত অর্থে গতিময় করবেন তিনি হচ্ছেন ফাউন্ডেশনের পুরোধা ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক। তাঁর নেতৃত্বেই তৈরি আমাদের আগামী কর্মপথ।

সুস্থ মন সুস্থ দেহ উৎসব হোক আনন্দবহ

প্রিয়া দত্ত। উদয়পুর।

জীবনশৈলী বা লাইফ স্টাইল একজন মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টেনশানহীন জীবনযাপন আমাদের অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। শরীর ও রোগ সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন হই তবে দক্ষতার সঙ্গে যে কোন রোগের মোকাবিলা করতে পারি। এতে করে ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকটা কমে যায়। প্রতিদিনের পাশাপাশি উৎসবের দিনগুলোকে আনন্দবহ করে তুলতে সুস্থমন ও সুস্থদেহ একান্ত জরুরী। সুখী সুন্দর জীবন যাপনের জন্য সুস্থতার বিকল্প নেই। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মন ও ভালো থাকে না। "সুস্থ দেহ সুন্দর মন" এটি একটি প্রবাদ বাক্য যা সর্বকালে সত্য বলে প্রমানিত। স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য সুস্থ দেহে সুন্দর মন অত্যাবশক।

ব্যায়াম ও খেলাধূলা শুধু দেহের বৃদ্ধি ঘটায় না, মনেরও উন্নতি সাধন করে। শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক, শরীর হচ্ছে মনের আধার। তাই শরীরিক সুস্থতার উপর নির্ভর করে মানসিক সুস্থতা।

উৎসবের দিনগুলোতে শরীরকে ভালো রাখার পাশাপাশি মানসিক ভাবে সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। একাধিক গবেষনায় দেখা গেছে যারা প্রাকৃতিক ও সুষম খাদ্যে অভ্যস্থ তাদের মানসিক স্বাস্থ্য অন্যদের চেয়ে ভালো থাকে।

আমাদের দেশের তরুন সমাজকে গ্রাস করে চলেছে মাদক। অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা বেশীর ভাগই কৌতূহলবশত মাদক সেবন করে এবং পরে এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। মাদক আসক্ত হওয়ার ফলে মস্তিষ্কে ডোপামিন নামের এক ধরনের কেমিক্যাল নিঃসরন হয় এবং এমন আচরন করে যা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। তাই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলোতে মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকবেন।

একথা আমরা সবাই জানি যে, নিয়মিত ফলমূল ও শাকসব্জি খাওয়ার চেষ্টা করলে শরীর সুস্থ থাকে। এই সঙ্গে পর্যপ্ত জলের বিকল্প নেই। মন ভালো রাখতে আমরা কত কিছুই না করি। তবে সহজ কিছু উপায় আছে যেগুলো মেনে চললে মন ভালো রাখা যায়। উৎসবের দিনগুলোতে আমরা আনন্দে মজে থাকি বলে সময়মতো ঘুম ও খাওয়া দাওয়া করা হয় না। তাই এই বিশেষ দিনগুলোতে সুস্থ থাকার জন্য ঘুমটা জরুরী। অনিদ্রায় থাকলে আপনার আনন্দে ফাটলধরতে পারে।

মন ভালো রাখতে চাইলে হাসি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপায়। তাই প্রাণখুলে হাসুন। উৎসবের দিনগুলো করে তুলুন হাস্যোজ্জ্বল। হাসি মস্তিষ্কে এন্ডরফিনের মাত্রা বাড়ায়, যা মানসিক শান্তি প্রদান করে। উৎসবের এই সময়ে লক্ষ্য নির্ধারনে বাস্তববাদী হওয়া জরুরী। হঠাৎ করে অনেক বেশী পরিমান শারীরিক কসরত শরীরের জন্য ভালো নাও হতে পারে। ধীরে ধীরে ব্যায়ামের পরিমান বাড়াতে হবে। একই ভাবে নতুন কোন অভ্যাস শুরু করতে চাইলে হঠাৎ অনেক বেশী চাপ নেওয়া ঠিক হবে না। নতুন অভ্যাস তৈরীর ক্ষেত্রে শুরু থেকেই একেবারে নিখুত হওয়ার চেষ্টা সফলতার অন্তরায় হতে পারে। ধীরে ধীরে লাইফ স্টাইলে পরিবর্তন আনুন।

সুস্থ দেহে সুস্থ মনে আপনার পরিবার পরিজনসহ আপনার উৎসবের দিনগুলোকে সুখময় করে তুলুন। আনন্দমুখর ও প্রানবন্ত করে তুলুন প্রতিটি মুহূর্ত।

SAHA MEDICAL HALL
(Chemist & Druggist)
Prop : Jayanta Saha
Mobile No. 9436131150
Central Road, Udaipur, Gomati, Tripura

মা দুর্গা

রীটন দেববর্মা। উদয়পুর।

মা শুধু আমার। শিশু বয়সে ভাবতাম তিনি আর কারো হতে পারেন না! কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি তিনি সবার। কারণ তিনিতো দুর্গতিহরণী। আমাদের মিশ্র বসতির জনপদে তাঁর পুজো সত্যিকার অর্থে সবার মাতৃআরাধনার রূপ পেতো। আদ্যাশক্তি মহামায়া বাঙালীর আরাধ্যাদেবী হলেও জনজাতিদের জীবনেও তিনি জুড়ে যেতেন নানা ভাবে। আমরাও সাজতাম নতুন পোশাকে। আনন্দ, হুল্লোড়, আলো সঙ্গে রকমারী খাবার সে যে কী অপূর্ব ভাললাগা। জীবনের ওই কটা দিন যেন স্বর্গসুখ! এতোসবের পাশা পাশি আনন্দময়ীর উৎসব উদযাপন আমাদের নানাভাবে শিক্ষাদানও করে থাকে।

দেবী তাঁর দশ হাতে দশ অস্ত্র ধরে আমাদের কোনও রকম বিপদকে ভয় না পাওয়ার শিক্ষা দেন। আজকের দিনে যখন প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও মহিলাদের সম্মান হানির খবর পাই, সেখানে মহিষাসুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারিনী দেবী আমাদের সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠার শিক্ষা দেন। নারী যে দুর্বল নয়, প্রয়োজনে অন্যায়কারীকে উচিত শাস্তি দিতে পারে। সেই শিক্ষা আমরা পাই মা দুর্গার কাছ থেকে।

সাধারণ ভাবে একজন পুরুষ একজন নারী থেকে গায়ের জোরে বেশী শক্তিশালী হয়। সেই হিসেবে প্রবল পরাক্রমশালী মহিষাসুরও নিশ্চিত ভাবে গায়ের জোড়ে দেবীর থেকে বেশীবলশালী ছিলেন। কিন্তু গায়ের জোরেই যে সব নয়, সাহস, বুদ্ধিও লড়াইয়ের ক্ষমতাই আমাদের জয় এনে দিতে পারে।

প্রত্যেক নারীর মধ্যেই আছে দেবীর অংশ। দেবী দুর্গার আশীর্বাদ সর্বদা বর্ষিত হয় সব নারীর উপরেই। কিন্তু আমরা প্রায় কেউই নিজেদের সেই অন্তরের দুর্গাকে খুঁজে পাই না। যখন যে নারী ঘরে বা বাইরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তখন তিনিই হন দেবী দুর্গা তাই ভয় ত্যাগ করে নিজের অন্তরের দুর্গাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যে দুর্গা আমাদের সবার মনে সুপ্ত অবস্থায় আছেন। তাঁর অনুসন্ধান করার শিক্ষা দেন দেবী।

আমাদের সবাইকে কখনোও না কখনোও অন্যায় রূপী অসুরের মুখোমুখি হতে হয়। নানা বিপদ, নানা সংকটের রূপ ধরে এই অসুরের আগমন ঘটে। তার সামনে দাঁড়িয়ে ভয় না পেয়ে মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের দেন দুর্গা। আমাদের সবার ভেতরে যে শক্তি আছে, তাকে যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি। সংসারের কাজ সামলেও নারী যেন তার ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে রাখতে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়া যায় মা দুর্গার কাছ থেকে।

দেবী শুধু অন্যায়ের নিধন করেন না, তিনি ভালোবাসাও ছড়িয়ে দেন সবার মধ্যে। তিনি শান্তিরূপিনী, তিনি প্রেমময়ী। দশ হাতে অস্ত্র ধরলেও নিজের এই রূপ কখনোও ভোলোননি মা দুর্গা। সব নারীকেই তিনি এই প্রেমময়ী রূপ জাগিয়ে রাখার শিক্ষা দেন। নারী সংসারের মঙ্গল আনে। ভালোবাসায় সুখে ভরিয়ে তোলে সবার জীবন।

বীরগাথা

অমিতাভ দাশ। উদয়পুর।

রাত বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল বৃষ্টি। উন্মত্ত গোমতী যেন আরও স্রোতস্বিনী হয়ে উঠেছে। চারদিকে বেড়ে চলেছে জলমগ্ন মানুষের সংখ্যা। ত্রাণ শিবিরে শিশু, পরিজনদের পাশে পোষ্যদের নিয়ে রাতযাপন করছেন অসহায় বাবা মা। উদ্বেগের পারদ বেড়ে চলেছে প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ, সবার। আশঙ্কায় কাটছে নিদ্রাহীন রাত। খোঁজ নিলেই শোনা যাচ্ছে প্লাবিত হয়েছে নতুন নতুন জনপদ। বিপদসীমার অনেক ওপর দিয়ে বইছে গোমতী। বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুঁটছেন দুর্গত মানুষ। জলসীমা বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। গোমতী জেলার সর্বত্র জারি হয়েছে 'রেড এলার্ট'। সন্ধ্যে থেকেই বারবার কাতর আবেদন আসছিল ফোনে। শেষ ফোনটি যখন এল রাত ১২টা। স্যার, আমার কোলের ৬ মাসের শিশু সন্তানটিকে বোধহয় আর বাঁচাতে পারবো না? যে বাড়ির ছাদে আমরা আশ্রয় নিয়েছি জল প্রায় তা ছুঁয়েই ফেলেছে। মনে হয় এই আমাদের শেষ রাত? ফোনের এপ্রান্তে যিনি কথা শুনছিলেন মুহূর্তের জন্য কেমন যেন স্থবির হয়ে গেলেন! চকিতে সম্বিৎ ফিরতেই শুরু হোল যোগাযোগ। প্রোটোকল অনুযায়ী গভীর রাতে উদ্ধার কাজে যাওয়ার অনুমোদন নেই। মানবিকতা আর প্রোটোকলের টানাপোড়েন! শেষ পর্যন্ত যাবতীয় নিয়মকানুন পাশে সরিয়ে রেখে স্পীড বোটে চেপে বসলেন ওঁরা ছ'জন! উত্তাল গোমতীর স্রোত আর ঘন কালো অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে উদ্ধারকারীদল। কিছুক্ষণ পেরুতেই দুর্গত বা উদ্ধারকারী সবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। কোনভাবেই কথা বলা যাচ্ছে না। এমনি করে পেরিয়ে গেল

অনেকটা সময়। এবার সত্যিকার অর্থেই জাপ্টে ধরেছে উৎকণ্ঠা আর ভয়। পেরিয়ে গেল আরও কিছুটা সময়। পূব আকাশে ভোরের আলোর ঝিলিক। তবুও কোন হদিস নেই। বিষন্নতা আর হতাশার পাহাড় যখন মাথায় ভেঙে পরার উপক্রম ঠিক তখনই এলো সেই কাঙ্খিত ফোন। ঘড়িতে সকাল ৯টা বেজে ১০মিনিট। স্যার, আমরা ওদের উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। ওরা সবাই ত্রাণ শিবিরে নিরাপদে রয়েছেন।

এবার একটু বিস্তারে বলি। অমরপুরের দেববাড়ী এলাকায় চারদিকে জলমগ্ন হয়ে একটি বাড়ীর ছাদে আটকে ছিলেন প্রায় শতাধিক মানুষ। গভীররাতে জলস্তর বাড়তে বাড়তে ছাদ ছুঁয়ে ফেলেছিল। ওদের জীবন বিপন্নপ্রায়। কিন্তু সেখান থেকে নেমে আসার সব পথই বন্ধ। ঠিক তখনই আলাদীনের প্রদীপ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন টি.এস.আর পঞ্চম ব্যাটেলিয়ানের পাঁচ জওয়ান এবং একজন সাধারণ নাগরিক। যারা নিজেদের মৃত্যু তুড়ি মেরে উড়িয়ে প্রথমে মহিলা ও শিশুদের এরপর পর্যায়ক্রমে আটকে থাকা প্রত্যেককে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ওদের অমূল্য জীবন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কেমন করে অন্যের জীবন বাঁচানোর দুঃসাহস দেখানো যায় তা শুধুমাত্র জানেন সুবেদার প্রদীপ চন্দ্র দাস, হাবিলদার সুধাংশু চন্দ্র বর্মন, রাইফেলম্যান রঞ্জন ভোরা, সুব্রত সরকার, সঞ্জীব দাস এবং বীরগঞ্জের বাসিন্দা দীপেন সাহা। আর জানে গহীন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকা তারারা, যারা সেই রাতের বীরগাথা লিখে রেখেছিলো কালো মেঘে আর গোমতীর উন্মাদ স্রোতে!